বনমর্ম্মর

ও অন্যান্য গল্প

শ্রীমনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪ বঙ্কিম
চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আনন্দমোহন প্রেসের পক্ষে মুদ্রাকর—
শ্রীঅনন্তলাল নাগ, ২৭।১ ইস্কুল রো, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ
দাম ২।০ আনা

এই লেখকের অন্যান্য বই—

ভুলি নাই (৩য় সংস্করণ)
বিপ্লব-উপন্যাস

*

একদা নিশীথ কালে
হাস্য-মধুর সচিত্র গল্প-প্রচয়

*

পৃথিবী কাদের ?
গল্পে বলিষ্ঠ মননশীলতা

*

নর-বাঁধ (২য় সংস্করণ)

দুঃখ-নিশার শেষে
ভাগা-ধরণীর স্বপ্ন-রঞ্জিত কাহিনী

*

নূতন প্রভাত
বাংলার প্রথম প্রগতি-নাট্য

*

প্লাবন
নাট্যভারতীতে অভিনীত জনপ্রিয় নাটক

*

দেবী কিশোরী

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

কলিকাতা

৯ই শ্রাবণ, ১৩৩৯ সাল

শ্রীমনোজ বসু

কাহিনী-সূচি

বনমর্ম্মর

*

মৌজাটি নিতান্ত ছোট নয়। অগ্রহায়ণ হইতে জরীপ চলিতেছে, খানাপুরী শেষ হইল এতদিনে; হিঞ্চে-কলমীর দামে আঁটা নদীর কূলে বটতলার কাছাকাছি সারি সারি তিনটি তাঁবু পড়িয়াছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ।

শঙ্কর-ডেপুটী সদর-ক্যাম্প হইতে আজ আসিয়া পৌছিয়াছে। উপলক্ষ একটা জটিল রকমের মোকদ্দমা। ছোকরা মানুষ, ভারী চটপটে—পত্নীবিয়োগের পর হইতে চাঞ্চল্য যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। আসিয়াই আমিনের তলব পড়িল।

আমিনকে ডাকিতে পাঠাইয়া একটা চুরুট বাহির করিল। চুরুটের কৌটায় সেই সাত মাস আগেকার শুকনো বেলের পাতা ক'টি এখনও রহিয়াছে।

সাত মাস আগে একদিন বিকালবেলা তাহাদের দেশের বাড়িতে দোতলার ঘরে ঢুকিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—সুধারাণী, কালকে কি বার?

সুধা বলিয়াছিল—পাঁজি দেখগে যাও, আমি জানিনে। তারপর হাসিয়া চোখ দু'টি বিস্ফারিত করিয়া বলিয়াছিল—চলে যাবেন, তাই ভয় দেখান হচ্ছে। ভারী কিনা ইয়ে—

শঙ্করও খুব হাসিয়াছিল। বলিয়াছিল—যদি মানা কর, তবে না হয় যাইনে—

—থাক।

কোন জবাব না দিয়া সুধারাণী অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় কোঁচাইয়া পাট করিতে লাগিল। শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া কাছে আনিল।

—শোন সুধারাণী, উত্তর দাও—

—বা-রে, পরের মনের কথা আমি জানি বুঝি!

—নিজের ত জান। তবু কথা কহে না দেখিয়া শঙ্কর বলিতে লাগিল—আমি চলে যাব বলে তোমার কষ্ট হচ্ছে কিনা সেই কথাটা বল আমায়—না বললে শুনছিনে কিছুতে—।

—না—

—সত্যি বলছ?

—না—না—না, বলিয়া হাত ছাড়াইয়া সুধা বাহির হইয়া যাইতেছিল। শঙ্কর পলায়নপরার সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

—মিছে কথা। দেখি, আমার দিকে চাও—কই, চাও দিকি, সুধারাণী—

সুধা তখন দুই চক্ষু প্রাণপণে বুজিয়া আছে। মুখ ফিরাইয়া ধরিতেই ঝর-ঝর করিয়া গাল বাহিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িল। আঁকিয়া বাঁকিয়া পাশ কাটাইয়া বধূ পলাইল।···

শেষ রাতে বৃষ্টি নামিয়াছে। লক্ষ্মণ বাহির হইতে ডাকিল—ছোটবাবু, ঘাটে ষ্টীমার সিটি দিয়েছে।

সুধারাণী গলায় আঁচল বেড়িয়া প্রণাম করিল। কহিল—দাঁড়াও একটু। তাড়াতাড়ি কুলুঙ্গীর কোণ হইতে সন্ধ্যাকালে গোছাইয়া-রাখা বিল্বপত্র আনিয়া হাতে দিল।—দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা,—হপ্তায় একখানা করে চিঠি দিও, যখন যেখানে থাক, বুঝলে?

আরও একটা দিনের কথা মনে পড়ে, এমনি এক বিকাল বেলা মামুদপুর ক্যাম্পে সে জরীপের কাজ করিতেছে, এমন সময় চিঠি আসিল, সুধারাণী নাই।

ইতিমধ্যে নক্মা ও কাগজপত্র লইয়া ভজহরি আমিন সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

—দু'শ দশ—এগার—তার উত্তরে এই হলো গে দু'শ বার নম্বর প্লট—বলিয়া ভজহরি নক্মার উপর জায়গাটা চিহ্নিত করিল। বলিতে লাগিল—অনাবাদি বন-জঙ্গল একটা, মানুষ-জন কেউ যায় না ওদিকে, তবু এই নিয়ে যত মামলা—

হঠাৎ একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, সে-ই কেবল বকিয়া মরিতেছে, শঙ্কর বোধ করি একবারও কাগজপত্রের দিকে তাকায় নাই—সামনের উত্তরের মাঠের দিকে এক নজরে তাকাইয়া আপন মনে দিবা শিষ দিতে সুরু করিয়াছে, চুরুটের আগুন নিভিয়া গিয়াছে—

বলিল—হ্যাঁ, ঐ যে তালগাছ ক'টার ওধারে কালো কালো দেখা যাচ্ছে—জঙ্গলের আরম্ভ ঐখানে। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক, কিন্তু ওর মধ্যে জমি অনেক···এইবারে রেকর্ড একবার দেখবেন হুজুর, ভারী গোলমেলে ব্যাপার—

—হাঁ হাঁ না—এই রকম বলিতে বলিতে একটু অপ্রস্তুত হইয়া শঙ্কর কাগজপত্রে মন দিল। পড়িয়া দেখিল, দু'শ বারর খতিয়ানে মালিকের নাম লেখা হইয়াছে, শ্রীধনঞ্জয় চাকলাদার।

ভজহরি বলিতে লাগিল—আগে ঐ একটা নাম শুধু

লিখেছিলাম। তারপর দেখুন ওর নিচে নিচে উড-পেন্সিল দিয়ে আরও সাতটা নাম লিখতে হয়েছে। রোজই এই রকম নতুন নতুন মালিকের উদয় হচ্ছে। আজ অবধি একুনে আটজন ত হলেন—যে রেটে ওঁরা আসতে লেগেছেন দু-একদিনের মধ্যে কুড়ি পুরে যাবে বোধ হচ্ছে, এই পাতায় কুলোবে না।

শঙ্কর কহিল—কুড়ি পুরে যাবে, দাঁওয়াচ্ছি আমি—রোসো না। আজই খতম করে দেব সব। তুমি ওদের আসতে বললে কখন?

—সন্ধ্যের সময়। গেরস্ত লোক সারাদিন কাজকর্ম্মে থাকে—একটু রাত হয় হবে, জ্যোৎস্না রাত আছে—তার আর কি?

আরও খানিকটা কাজকর্ম্ম দেখিয়া শঙ্কর সহিসকে ঘোড়া সাজাইতে হুকুম দিল। বলিল—মাঠের দিক দিয়ে চক্কোর দিয়ে আসা যাক একটা—এ রকম হাত-পা কোলে করে তাঁবুর মধ্যে কাঁহাতক বসে থাকা যায়? এ জায়গাটা কিন্তু তোমরা বেশ সিলেক্ট করেছ, আমিন মশাই। ওগুলো ভাঁটফুল, না? কিন্তু গাঙের দশা দেখে হাসি না কাঁদি—

বলিতে বলিতে আবার কি ভাবিল। বলিল—ঘোড়া থাকুগে, এক কাজ করলে হয় বরং—চল না কেন দু'জনে পায়ে পায়ে জঙ্গলটা ঘুরে আসি। মাইলখানেক হবে—কি বল? বিকেলে ফাঁকায় বেড়ালে শরীর ভাল থাকে। চল—চল—

মাঠের ফসল উঠিয়া গিয়াছে। কোনদিকে লোক-চলাচল নাই। শঙ্কর আগে আগে যাইতেছিল, ভজহরি পিছনে।

জঙ্গলের সামনেটা খাতের মতো,—অনেকখানি চওড়া, খুব নাবাল। সেখানে ধান হইয়া থাকে, ধানের গোড়াগুলা রহিয়াছে। পাশ দিয়া উঁচু আল বাঁধা।

সেখানে আসিয়া শঙ্কর কহিল—গাঙের বড় খাল-টাল ছিল এখানে?

ভজহরি কহিল—না হুজুর, খাল নয়—এটা গড়খাই। সামনের জঙ্গলটা ছিল গড়—

—গড়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজারামের গড়। রাজারাম বলে নাকি কে-একজন কোনকালে এখানে গড় তৈরি করেছিলেন। এখন তার কিছু নেই, জঙ্গল হয়ে গেছে সব।

তারপর দু'জনে নিঃশব্দে চলিতে লাগিল।

মাঝে একবার শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—বাঘ-টাঘ নেই ত হে?

ভজহরি তাচ্ছিল্যের সহিত জবাব দিল—বাঘ! চারিদিকে ধু-ধূ করছে ফাঁকা মাঠ, এখানে কি আর—তবে হ্যাঁ, অন্যান্যবার শুনলাম কেঁদো-গোবাঘা দু-একটা আসত। এবারে আমাদের জ্বালায়—বলিয়া হাসিল। বলিতে লাগিল—উৎপাতটা আমরা কি কম করছি, হুজুর? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই—কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে করে সমস্তটা দিন। ঐ পথ যা দেখছেন, জঙ্গল কেটে আমরাই বের করেছি, আগে পথঘাট কিছু ছিল না—এ অঞ্চলের কেউ এ বনে আসে না—

বনে ঢুকিয়া খানিকটা যাইতেই মনে হইল, এই মিনিট-দুয়ের মধ্যেই বেলা ডুবিয়া রাত্রি হইয়া গেল।

ঘন শাখাজাল-নিবদ্ধ গাছপালা, আম আর কাঁটাল গাছের সংখ্যাই বেশি, পুরু বাকল ফাটিয়া চৌচির হইয়া গুঁড়িগুলি পড়িয়া আছে যেন এক একটা অতিকায় কুমীর, ছাতাধরা সবুজ···ফাঁকে ফাঁকে পরগাছা···একদা মানুষেই যে ইহাদের পুতিয়া লালন করিয়াছিল আজ আর তাহা বিশ্বাস হয় না। কত শতাব্দীর শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মাথার উপর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, তলার আঁধারে এইসব গাছপালা আদিম-কালের কত সব রহস্য লুকাইয়া রাখিয়াছে, কোনদিন সূর্য্যকে উঁকি মারিয়া কিছু দেখিতে দেয় নাই !···

এই রকম একটানা কিছুক্ষণ চলিতে চলিতে শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

—ওখানটায় ত ফাঁকা বেশ! জল চকচক করছে—না ?

আমিন বলিল—ওর নাম পঙ্কদীঘি—

—খুব পাঁক বুঝি ?

—তা হবে, কেউ কেউ আবার বলে পঙ্খী-দীঘির থেকে পঙ্কদীঘি হয়েছে—

বলিয়া ভজহরি গল্প আরম্ভ করিল।

সেকালে এই দীঘির কালো জলে নাকি অতি সুন্দর ময়ূরপঙ্খী ভাসিত। আকারেও সেটি প্রকাণ্ড—দুই কামরা, ছয়খানি দাঁড়। এত বড় ভারি নৌকা, কিন্তু তলার ছোট একখানা পাটা একটুখানি ঘুরাইয়া দিয়া পলকের মধ্যে সমস্ত ডুবাইয়া ফেলা যাইত। দেশে সে সময় শাসন ছিল না, চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগেরা আসিয়া লুটতরাজ করিত, জমিদারদের মধ্যে রেশারেশি লাগিয়াই ছিল। প্রত্যেক বড়লোকের প্রাসাদে গুপ্তদ্বার ও গুপ্তভাণ্ডার থাকিত, মান-সম্ভ্রম লইয়া পলাইয়া

যাইবার—অন্ততঃপক্ষে মরিবার অনেক সব উপায় সম্ভ্রান্ত লোকেরা হাতের কাছে ঠিক করিয়া রাখিতেন। কিন্তু নৌকার বহিরঙ্গ দেখিয়া এসব কিছু ধরিবার জো ছিল না। চমৎকার ময়ূরকণ্ঠি রঙে অবিকল ময়ূরের মত করিয়া গলুইটি কুঁদিয়া তোলা—শোনা যায়, এক-একদিন নিঝুম রাতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে রাজারামের বড় ছেলে জানকীরাম তাঁর তরুণী পত্নী মালতীমালাকে লইয়া চিত্রবিচিত্র ময়ূরের পেখমের মতো পাল তুলিয়া ধীর বাতাসে ঐ নৌকায় দীঘির উপর বেড়াইতেন। এই মালতীমালাকে লইয়া এ অঞ্চলের চাষারা অনেক ছড়া বাঁধিয়াছে, পৌষসংক্রান্তির আগের দিন তাহারা বাড়ি বাড়ি সেই সব ছড়া গাহিয়া নতুন চাউল ও গুড় সংগ্রহ করে, পরদিন দল বাঁধিয়া সেই গুড়-চাউলে আমোদ করিয়া পিঠা খায়।

গল্প করিতে করিতে তখন তাহারা সেই দীঘির পাড়ের কাছে আসিয়াছে। ঠিক কিনারা অবধি পথ নাই, কিন্তু নাছোড়বান্দা শঙ্কর ঝোপঝাড় ভাঙিয়া আগাইতে লাগিল। ভজহরি কিছুদূরে একটা নিচু ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নল-খাগড়ার বন দীঘির অনেক উপর হইতে আরম্ভ হইয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে, তারপর কচো-শেওলা শাপলার ঝাড়। ঝুঁকিয়া-পড়া গাছের ডাল হইতে গুলঞ্চলতা ঝুলিতেছে। একটু দূরের দিকে কিন্তু কাকচক্ষুর মতো কালো জল। সাড়া পাইয়া ক'টা ডা'কপাখী নলবনে ঢুকিল। অল্প খানিকটা ডাইনে বিড়ালআচড়ার কাঁটা-ঝোপের নিচে

এককালে যে বাঁধানো ঘাট ছিল, এখনও বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সেই ভাঙাঘাটের অনতিদূরে পাতলা পাতলা সেকেলে ইটের পাহাড়। কতদিন পূর্ব্বে বিস্মৃত শতাব্দীর কত কত নিভৃত সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রে জানকীরাম হয় ত প্রিয়তমাকে লইয়া ওখান হইতে টিপিটিপি এই পথ বহিয়া এই সোপান বহিয়া দীঘির ঘাটে ময়ূরপঙ্খীতে চড়িতেন। গভীর অরণ্যছায়ে সেই আসন্ন সন্ধ্যায় ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের সমস্ত সম্বিৎ হঠাৎ কেমন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

—ধ্যেৎ, আমার ভয় করে—কেউ যদি দেখে ফেলে!

—কে দেখবে আবার? কেউ কোথাও জেগে নেই, চল মালতীমালা—লক্ষীটি, চল যাই—

—আজ থাক, না না—তোমার পায়ে পড়ি, আজকের দিনটি থাক শুধু—

ঐ যেখানে আজ পুরানো ইটের সমাধিস্তূপ ওখানে বড় বড় কক্ষ অলিন্দ বাতায়ন ছিল, উহারই কোনখানে হয় ত একদা তারা-খচিত রাত্রে ময়ূরপঙ্খীর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা শুনিতে শুনিতে এক তন্বঙ্গী রূপসী রাজবধূর চোখের তারা লোভে ও কৌতুকে নাচিয়া উঠিতেছিল, শব্দ হইবে বলিয়া স্বামী হয়ত বধূর পায়ের নূপুর খুলিয়া দিল, নিঃশব্দে খিড়কী খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া দুইটি চোর সুপ্তপুরী হইতে বাহির হইয়া ঘাটের উপর নৌকায় উঠিল, রাজবাড়ির কেউ তা জানিল না। ফিসফাস কথাবার্ত্তা···স্বচ্ছ মেঘের আড়ালে চাঁদ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল···শব্দ হইবার ভয়ে দাঁড়ও নামায়

নাই···এমনি বাতাসে বাতাসে ময়ূরপঙ্খী মাঝদীঘি অবধি ভাসিয়া চলিল···

ভাসিতে ভাসিতে দূরে—বহুদূরে—শতাব্দীর আড়ালে কোথায় তাহারা ভাসিয়া গিয়াছে!

ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের কেমন ভয় করিতে লাগিল। গভীর নির্জ্জনতার একটি ভাব। আছে, এমন জায়গায় এমনি সময় আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তাহা স্পষ্ট অনুভব হয়। চারিপাশের বনজঙ্গল অবধি ঝিন-ঝিন করিয়া যেন এক অপূর্ব্ব ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভয় হইল, আরও কিছুক্ষণ সে যদি এখানে এমনি ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, জমিয়া নিশ্চয় গাছের গুঁড়ির মতো হইয়া এই বনরাজ্যের একজন হইয়া যাইবে; আর নড়িবার ক্ষমতা থাকিবে না।···সহসা সচেতন হইয়া বারম্বার সে নিজের স্বরূপ ভাবিতে লাগিল, সে সরকারি কর্ম্মচারী···তার পসার-প্রতিপত্তি···ভবিষ্যতের আশা···মনকে ঝাঁকা দিয়া দিয়া সমস্ত কথা স্মরণ করিতে লাগিল। ডাকিল—আমিন মশাই!

ভজহরি কহিল—সন্ধ্যে হয়ে গেল, হুজুর—

—যাচ্ছি।

ক্যাম্পের কাছাকাছি হইয়া শঙ্কর হাসিয়া উঠিল। কহিল—ডাকাত পড়েছে নাকি আমাদের তাঁবুতে? বাপরে বাপ! এবং হাসির সহিত ক্ষণপূর্ব্বের অনুভূতিটা সম্পূর্ণরূপে উড়াইয়া

দিয়া বলিতে লাগিল—চুরুট টেনে টেনে তো আর চলে না—হুঁকো-কলকের ব্যবস্থা করতে পার আমিন মশাই, খাঁটি স্বদেশি মতে বসে বসে টানা যায়—

আমিনও হাসিয়া বলিল—অভাব কি? মুখের কথা না বেরুতে গাঁ থেকে বিশটা রূপোবাঁধা হুঁকো এসে হাজির হবে, দেখুন না একবার—

.

গ্রামের ইতর-ভদ্র অনেকে আসিয়াছিল, উহাদের দেখিয়া তটস্থ হইয়া সকলে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। মিনিট দশেক পরে শঙ্কর তাঁবুর বাহিরে আসিয়া মামলার বিচারে বসিল। বলিল—মুখের কথায় হবে না কিছু, আপনাদের দলিলপত্তোর কার কি আছে দেখান একে একে—ধনঞ্জয় চাকলাদার আগে আসুন—

ধনঞ্জয় সামনে আসিল। কোষ্ঠির মত জড়ানো একখানা হলদে রঙের কাগজ, কালো ছাপ-মারা, পোকায় কাটা, সেকেলে বাংলা হরপে লেখা। শঙ্কর বিশেষ কিছু পড়িতে পারিল না, ভজহরি কিন্তু হেরিকেনটা তুলিয়া ধরিয়া অবাধে আগাগোড়া পড়িয়া গেল। কে একজন দয়ালকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী নামজাদ রাজা-রামের গড় একশ' বার বিঘা নিষ্কর জায়গা-জমি সার বাগিচা-পুষ্করিণী তারণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়ের নিকট সুস্থ শরীরে সরল মনে খোসকোবলায় বিক্রয় করিতেছে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—ঐ তারণচন্দ্র চাকলাদার আপনার কেউ হবেন বুঝি, ধনঞ্জয়বাবু?

ধনঞ্জয় সোৎসাহে কহিতে লাগিল—ঠিক ধরেছেন হুজুর, তারণচন্দোর আমার প্রপিতামহ, পিতামহ হলেন কৈলাসচন্দোর—তাঁর বাবা। তিরাশী সন থেকে এই সব নিষ্করের সেস গুণে আসছি কালেক্টরিতে, ডেভিড সাহেবের জরিপের চিঠে রয়েছে। কবলার তারিখটা একবার লক্ষ্য করে দেখবেন, হুজুর—

আরও অনেক কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু উপস্থিত অনেকে না না—করিয়া উঠিল। তাহারাও রাজারামের গড়ের মালিক বলিয়া নাম লেখাইয়াছে, এতক্ষণ অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতেছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না।

ধমক খাইয়া সকলে চুপ করিল। শঙ্কর ভজহরিকে চুপি চুপি কহিল—তুমি ঠিক লিখেছ, চাকলাদার আসল মালিক, আপত্তিগুলো ভুয়ো—ডিসমিস করে দেব—

ভজহরি কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আসল মালিক ধরা বড় শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে, হুজুর—

—বার-শ উনিশ সনের পুরোনো দলিল দেখাচ্ছে যে!

ভজহরি কহিতে লাগিল—এখানে আটঘরা গ্রামে একজন লোক রয়েছে, ন-সিকে কবুল করুন তার কাছে গিয়ে—উনিশ সন ত কালকের কথা, হুবহু আকব্বর বাদশার দলিল বানিয়ে দেবে। আসল নকল চেনা যাবে না।

বস্তুত ধনঞ্জয়ের পর অন্যান্য সাতজনের কাগজপত্র তলব করিয়া দেখা গেল, ভজহরি মিথ্যা বলে নাই—ঐ রকম পুরানো দলিল সকলেরই আছে। এবং বাঁধুনিও প্রত্যেকটির এমনি নিখুঁত যে যখনই যাহার কাগজ দেখে একেবারে

নিঃসন্দেহ বুঝিয়া যায়, রাজারামের গড়ের মালিক একমাত্র সেই লোকটাই। এ যেন গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া গেল। বিস্তর ভাবিয়া-চিন্তিয়াও সাব্যস্ত হইল না কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখা যায়।

হাল ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে শঙ্কর বলিল—দেখুন মশাইরা, আপনারা ভদ্রসন্তান—

হাঁ—হাঁ—করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল।

—এই একটা প্লট একসঙ্গে ঐরকম ভাবে আটজনের ত হতে পারে না?

সকলেই ঘাড় নাড়িল। অর্থাৎ—নয়ই ত—

—আপনারা হলফ করে বলুন, এর সত্যি মালিক কে।

ভদ্রসন্তানেরা তাহাতে পিছপাও নহেন। একে একে সামনে আসিয়া ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিল—তু'শ বারর প্লট একমাত্র তাহারই, অপর সকলে চক্রান্ত করিয়া মিথ্যা কথা কহিতেছে।

লোকজন বিদায় হইয়া গেলে শঙ্কর বলিল—না, এরা পাটোয়ারি বটে দেখে শুনে সম্ভ্রম হচ্ছে।

ভজহরি মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, এরকম সে অনেক দেখিয়াছে।

শঙ্কর বলিতে লাগিল—তোমার কথাই মেনে নিলাম যে কাঁচা দলিলগুলো জাল। কিন্তু যে গুলো রেজেষ্ট্রী? দেখ, এদের দুরদৃষ্টি কত দেখ একবার—কবে কি হবে তু'পুরুষ আগে থেকে তাই তৈরি হয়ে আসছে। চুলোয় যাকগে দলিল-

পত্তোর—তুমি গাঁয়ে খোঁজখবর করে কি পেলে বল? যা হোক একরকম রেকর্ড করে যাই—পরে যেমন হয় হবে—

ভজহরি বলিল—কত লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আসবার আগে কত সাক্ষীসাবুদ তলব করেছি, সে আরও মজা—এক একজনে এক এক রকম বলে। বলিয়া সহসা প্রচুর হাসিতে হাসিতে বলিল—নরলোকে আস্কারা হল না, এখন একবার কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করতে পারলে হয়—

শঙ্কর কথাটা বুঝিতে পারিল না।

ভজহরি বলিতে লাগিল—কুমার বাহাদুর মানে জানকীরাম। সেই যে তখন ময়ূরপঙ্খার কথা বলছিলাম, গাঁয়ের লোকেরা বলে আশপাশের গ্রাম নিশুতি হয়ে গেলে জানকীরাম নাকি আসেন—উত্তর মাঠের ঐ নাককাটির খাল পেরিয়ে তেঘরা-বকচরের দিক থেকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে রোজ রাত্তিরে মালতীমালার সঙ্গে দেখা করে যান—সে ভারি অদ্ভুত গল্প,—কাজকর্ম্ম নেই ত এখন?

*　　*　　*　　*

তারপর রাত্রি অনেক হইল। তিনটি তাঁবুরই আলো নিভিয়াছে, কোন দিকে সাড়াশব্দ নাই। শঙ্করের ঘুম আসিতেছিল না। একটা চুরুট ধরাইয়া বাহিরে আসিল, আসিয়া মাঠে খানিক পায়চারি করিতে লাগিল।

ভজহরি বলিয়াছিল—কেবল জঙ্গল নয় হুজুর, এই মাঠেও সন্ধ্যের পর একলা কেউ আসে না। এই মাঠ সেই যুদ্ধক্ষেত্র, নদীপথে শত্রুরা এসেছিল। বেলা না ডুবতে রাজারামের পাঁচশ' ঢালী ঘায়েল হয়ে গেল, সেই পাঁচশ' মড়ার পা ধরে টেনে টেনে পরদিন ঐ নদীতে ফেলে দিয়েছিল···

উলুঘাসের উপর পা ছড়াইয়া চুপটি করিয়া বসিয়া শঙ্কর আনমনে ক্রমাগত চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

চারশ' বছর আগে আর একদিন সন্ধ্যায় গ্রামনদী-কূলবর্ত্তী এই মাঠের উপর এমনি চাঁদ উঠিয়াছিল। তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়া সমস্ত মাঠে ভয়াবহ শান্তি থমথম করিতেছে। চাঁদের আলোয় স্তব্ধ রণভূমির প্রান্তে জানকীরামের জ্ঞান ফিরিল। দূরে গড়ের প্রাকারে সহস্র সহস্র মশালের আলো···আকাশ চিরিয়া শত্রুর অশ্রান্ত জয়োল্লাস···দুই হাতে ভর দিয়া অনেক কষ্টে জানকীরাম উঠিয়া বসিয়া তাঁহারই অনেক আশা ও ভালবাসার নীড় ঐ গড়ের দিকে চাহিতে চাহিতে অকস্মাৎ দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। ললাটের রক্তধারা ডান হাতে মুছিয়া ফেলিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন, কেবল কয়েকটা শিয়াল নিঃশব্দে শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—কোন দিকে কেহ নাই···

সেই সময়ে ওদিকে অন্দরের বাতায়নপথে তাকাইয়া মালতীমালাও চমকিয়া উঠিলেন, তবে কি একেবারেই—?

অবমানিত রাজপুরীর উপরেও গাঢ় নিঃশব্দতা নামিয়া আসিয়াছে। দাসী বিবর্ণমুখে পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতীমালা আয়ত কালো চোখে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—শেষ ?

খবর আসিল, গুপ্তদ্বার খোলা হইয়াছে, পরিজনেরা সকলে বাহির হইয়া যাইতেছে।

দাসী বলিল—বউমা, উঠুন—

বধূ বলিলেন—নৌকা সাজানো হোক্।

কেহ সে কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। নদীর ঘাটে শত্রুর বহর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সে সন্ধানী-দৃষ্টি ভেদ করিয়া জলপথে পলাইবার সাধ্য কি !

মালতীমালা বলিলেন—নদীর ঘাটে নয় রে, দীঘির ময়ূর-পঙ্খী সাজাতে হুকুম দিয়েছি। খবর নিয়ে আয় হল কি না—

সেদিন সন্ধ্যায় রাজোদ্যানে কনকচাঁপা গাছে যে ক'টি ফুল ফুটিয়াছিল তাড়াতাড়ি সেগুলি তুলিয়া আনা হইল, মালতীমালা লোটন-খোঁপা ঘিরিয়া তার কতকগুলি বসাইলেন, বাকীগুলি আঁচল ভরিয়া লইলেন। সাধের মুক্তাফল দু'টি কানে পরিলেন, পায়ে আলতা দিলেন, মাথায় উজ্জ্বল সিঁদুর পরিয়া কত মনোরম রাত্রির ভালবাসার স্মৃতি-মণ্ডিত ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে গিয়া বসিলেন।

নৌকা ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূর গেল। তখন বিজয়ীরা গড়ে ঢুকিয়াছে, দীঘির পাড় দিয়া দলে দলে রক্ত-

পতাকা উড়াইয়া জনমানবশূন্য প্রাসাদে ঢুকিতে লাগিল। সমস্ত পুরবাসী গুপ্তপথে পলাইয়াছে।

বিশ-পঁচিশটি মশালের আলো দীঘির জলে পড়িল।

—ধর, ধর নৌকো—

মালতীমালা তলীর পাটাখানি খুলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ মাস্তুলটিও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নৌকা কেহ ধরিতে পারিল না, কেবল কেমন করিয়া কোন ফাঁক দিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিল আঁচলের চাঁপাফুল কয়েকটি—

তারপর ক্রমে রাত্রি আরো গভীর হইয়া গড়ের উঁচু চূড়ার আড়ালে চাঁদ ডুবিল। আকাশে কেবল উজ্জ্বল তারা কয়েকটি পরাজিত বিগত-গৌরব ভগ্নজানু জানকীরামের ধূলিশয্যার উপর নির্নিমেষ দৃষ্টি বিসারিত করিয়া ছিল। সেই সময়ে কে একজন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া অতি সন্তর্পণে আসিয়া রাজকুমারকে ধরিয়া তুলিল।

—চলুন, প্রভু—

—কোথা ?

—বটতলায়। ওখানে ঘোড়া রেখেছি, ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চলে যাব।

গড়ের আর-আর সব ?

বিশ্বস্ত পরিচারক গড়ের ঘটনা সব কহিল। বলিল—কোন চিহ্ন নেই আর জলের উপরে কনকচাঁপা ছাড়া—

—কই? বলিয়া জানকীরাম হাত বাড়াইলেন। বলিলেন—আনতে পার নি? ঘোড়ায় তুলে দিতে পার আমায়? দাও না আমায় তুলে দয়া করে—আমি একটা ফুল আনব শুধু—

নিষেধ মানিলেন না। খটখট খটখট করিয়া সেই অন্ধকারে উত্তরমুখো বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিল। সকালে দেখা গেল, পরিখার মধ্যে যেখানে আজকাল ধান হইয়া থাকে—জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া আছেন, ঘোড়ার কোন সন্ধান নাই।

সেই হইতে নাকি প্রতিরাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে। রাতদুপুরে সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন মধ্য-আকাশে আসিয়া পৌঁছায়, আশপাশের গ্রামগুলিতে নিষুপ্তি ক্রমশ গাঢ়তম হইয়া উঠে, সেই সময়ে রাতের পর রাত ঐ গভীর নির্জ্জন জঙ্গলের মধ্যে চারশ' বছর আগেকার সেই রাজ-বধূ পঙ্কদীঘির হিম-শীতল অতল জলশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান। ভাঙা ঘাটের সোপান বহিয়া বিড়ালআঁচড়ার গভীর কাঁটাবন দুই হাতে ফাঁক করিয়া সাবধানে লঘুচরণ ফেলিয়া তিনি ক্রমশ আগাইতে থাকেন। তবু বনের একটানা ঝিঁঝির আওয়াজের সঙ্গে পায়ের নূপুর ঝুন-ঝুন করিয়া বাজিয়া উঠে, কুঙ্কুমে মাজা মুখ···গায়ে শ্বেতচন্দন আঁকা···সিঁথায় সেই চার শতাব্দী আগেকার সিঁদুর লাগানো...পায়ে রক্তবরণ আলতা, অঙ্গের চিত্র-বিচিত্র কাঁচলী ও মেঘডম্বুর শাড়ী হইতে জল ঝরিয়া ঝরিয়া বনভূমি সিক্ত করে···বনের প্রান্তে আমের গুঁড়ি ঠেস দিয়া দক্ষিণের মাঠে তিনি তাকাইয়া থাকেন···

আবার বর্ষায় যখন ঐ গড়খাই কানায় কানায় একেবারে ভরিয়া যায়, ঘোড়া তখন জল পার হইয়া বনের সামনে পৌঁছিতে

পারে না, মালতীমালা সেই কয়েকটা মাস আগাইয়া ফাঁকা মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ান। দুধ-সর ধানের সুগন্ধি ক্ষেতের পাশে পাশে ভিজা আলের উপর হিম-রাত্রির শিশিরে পায়ের আলতার অস্পষ্ট ছোপ লাগে, চাষারা সকাল বেলা দেখিতে পায়, কিন্তু রোদ উঠিতে না উঠিতে সমস্তই নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যায়···

চুরুটের অবশিষ্টটুকু ফেলিয়া দিয়া শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মাঠের ওদিকে মুচিপাড়ায় পোয়ালগাদা, খোড়োঘর, নূতন-বাঁধা গোলাগুলি কেমন বেশ শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। চৈত্রমাসের সুশুভ্র জ্যোৎস্নায় দূরের আবছা বনের দিকে চাহিতে চাহিতে চারিদিককার সুপ্তিরাজ্যের মাঝখানে বিকালের দেখা সেই সাধারণ বন হঠাৎ অপূর্ব্ব রহস্যময় ঠেকিল। ঐ খানে এমনি সময়ে বিস্মৃত যুগের বধূ তাকাইয়া আছে, নায়ক তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সেই দিকে যাইতেছে, কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মনে হয়, সন্ধ্যাকালে ওখানে সে যে অচঞ্চল নিষ্ক্রিয় ভাব দেখিয়া আসিয়াছে, এতক্ষণ জঙ্গলের সে রূপ বদলাইয়া গিয়াছে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আজও যাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই তাহারই কোন একটা অপূর্ব্ব ছন্দ-সঙ্গীতময় গুপ্তরহস্য এতক্ষণ ওখানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার সুধারাণীর কথা মনে পড়িল—সে যা-যা বলিত, যেমন করিয়া হাসিত, রাগ করিত, ব্যথা দিত, প্রতি-দিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সেই সব কথা। ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের চোখে জল আসিয়া পড়িল। জাগরণের মধ্যে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া

কোনদিন সে আর আসিবে না।···ক্রমশ তাহার মনে কারণ-যুক্তিহীন একটা অদ্ভুত ধারণা চাপিয়া বসিতে লাগিল। ভাবিল, সে দিনের সেই সুধারাণী, তার হাসি চাহনি, তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রত্যেকটি স্পন্দন পর্য্যন্ত এই জগৎ হইতে হারায় নাই—কোনখানে সজীব হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, মানুষে তার খোঁজ পায় না। ঐ সব জনহীন বনে জঙ্গলে এইরূপ গভীর রাত্রে একবার খোঁজ করিয়া দেখিলে হয়। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কেবল মালতীমালা সুধারাণী নয়, সৃষ্টির আদিকাল হইতে যত মানুষ অতীত হইয়াছে, যত হাসিকান্নার ঢেউ বহিয়াছে, যত ফুল ঝরিয়াছে, যত মাধবী রাত্রি পোহাইয়া গিয়াছে, সমস্তই যুগের আলো হইতে এমনি কোথাও পলাইয়া রহিয়াছে। তদ্‌গত হইয়া যেই মানুষ পুরাতনের স্মৃতি ভাবিতে বসে অমনি গোপন আবাস হইতে তারা টিপি টিপি বাহির হইয়া মনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। স্বপ্নঘোরে সুধারাণী এমনি কোনখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কত রাতে তার পাশে আসিয়া বসিয়াছে, আদর করিয়াছে, ঘুম ভাঙিলে আবার বাতাসে মিলাইয়া পলাইয়া গিয়াছে।···

বটতলায় বটের ঝুরির সঙ্গে ঘোড়া বাঁধা ছিল, ঐখানে আপাতত আস্তাবলের কাজ চলিতেছে, পৃথক ঘর আর বাঁধা হয় নাই। নিজে নিজেই জিন কষিয়া স্বপ্নাচ্ছন্নের মত শঙ্কর ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। ঘোড়া ছুটিল। সুপ্ত গ্রামের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনুকম্পা লইতে লাগিল—মূর্খ তোমরা, জঙ্গলের বড় বড় কাঁঠাল গাছগুলাই তোমাদের কেবল নজরে পড়িল এবং গাছ মারিয়া তক্তা কাটাইয়া দু'পয়সা পাইবার লোভে এত মোকর্দ্দমা-মামলা করিয়া মরিতেছে, গভীর নিঝুম রাত্রে ছায়ামগ্ন সেই আম-

কাঁঠাল-পিত্তিরাজের বন, সমস্ত ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল, পদ্মদীঘির এপার-ওপার যাঁদের রূপের আলোয় আলো হইয়া যায়, এতকাল পাশাপাশি বাস করিলে একটা দিন তাঁদের খবর লইতে পারিলে না!

গড়খাই পার হইয়া বনের সামনে আসিয়া ঘোড়া দাঁড়াইল। একটা গাছের ডালে লাগাম বাঁধিয়া শঙ্কর আমিনদের সেই জঙ্গল-কাটা সঙ্কীর্ণ পথের উপর আসিল। প্রবেশ-মুখের দুইধারে দুইটি অতিবৃহৎ শিরীষ গাছ, বিকালে ভজহরির সঙ্গে কথায় কথায় এসব নজর পড়ে নাই, এখন বোধ হইল মায়াপুরীর সিংহদ্বার উহারা! সেইখানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সে সেই ছায়াময় নৈশ বনভূমি দেখিতে লাগিল। আর তাহার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না, মৃত্যু-পারের গুপ্ত রহস্য আজি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে ঐখান হইতে নিশ্চয় আবিষ্কার করিতে পারিবে। আমাদের জন্মের বহুকাল আগে এই সুন্দরী পৃথিবীকে যারা ভোগ করিত, বর্ত্তমান কালের দুঃসহ আলো হইতে তারা সব তাদের অদ্ভুত রীতি-নীতি বীর্য্য ঐশ্বর্য্য প্রেম লইয়া সৌরালোকবিহীন ঐ বন-রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। আজ জনহীন মধ্য-রাত্রে যদি এই সিংহ-দ্বারে দাঁড়াইয়া নাম ধরিয়া ধরিয়া ডাক দেওয়া যায়, শতাব্দী-পারের বিচিত্র মানুষেরা অন্ধকারের যবনিকা তুলিয়া নিশ্চয় চাহিয়া দেখিবে।

কয়েক পা আগাইতে অসাবধান পায়ের নিচে শুকনা ডালপালা মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া যেন মর্ম্মস্থানে বড় ব্যথা

পাইয়া বনভূমি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। স্থির গম্ভীর অন্ধকারে নির্ণিরীক্ষ সান্ত্রিগণ তাহাকে বাক্যহীন আদেশ করিল—জুতা খুলিয়া এস—

শুকনা পাতা খসখস করিতেছে, চারিপাশে কত লোকের আনাগোনা…জ্যোৎস্নার আলো হইতে আঁধারে আসিয়া শঙ্করের চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছে বলিয়াই সে যেন কিছু দেখিতে পাইতেছে না। মনের ঔৎসুক্যে উদ্বেগাকুল আনন্দে কম্পিত হস্তে পকেট হইতে তাড়াতাড়ি সে টর্চ্চ বাহির করিয়া জ্বালিল।

জ্বালিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে—শূন্য বন। বিশ্বাস হইল না, বারম্বার দেখিতে লাগিল।…আর একটা দিনের ব্যাপার শঙ্করের মনে পড়ে। দুপুরবেলা, বিয়ের কয়েকটা দিন পরেই সুধারাণি ও আর কে-কে তার নূতন দামী তাসজোড়া লইয়া চুরি করিয়া খেলিতেছিল। তখন তার আর এক গ্রামে নিমন্ত্রণে যাইবার কথা, সন্ধ্যার আগে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু কি ভাবিয়া যাওয়া হইল না। বাহির হইতে খেলুড়েদের খুব হৈ-চৈ শোনা যাইতেছিল: কিন্তু ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতে সকলে কোন দিক দিয়া কি করিয়া যে পলাইয়া গেল—শঙ্কর দেখিয়াছিল, কেবল তাসগুলি বিছানার উপর ছড়ানো…

টর্চ্চের আলোর কাঁটাবনের ফাঁকে ফাঁকে সাবধানে দীঘির সোপানের কাছে গিয়া সে বসিল। জলে জ্যোৎস্না চিকচিক করিতেছে। আলো নিভাইয়া চুপটি করিয়া অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল।

ক্রমে চাঁদ পশ্চিমে হেলিয়া পড়িল। কোন দিকে কোন শব্দ নাই, তবু অনুভব হয়—তার চারিপাশের বনবাসীরা ক্রমশ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে। প্রতিদিন এই সময়ে তারা একটি অতি দরকারী নিত্যকর্ম্ম করিয়া থাকে, শঙ্কর যতক্ষণ এখানে থাকিবে ততক্ষণ তা হইবে না—কিন্তু তাড়া বড্ড বেশী। নিঃশব্দে ইহারা তার চলিয়া যাওয়ার প্রতীক্ষা করিতেছে।

হঠাৎ কোনদিক হইতে হু-হু করিয়া হাওয়া বহিল, এক মুহূর্ত্তে মর্ম্মরিত বনভূমি সচকিত হইয়া উঠিল। উৎসবক্ষেত্রে নিমন্ত্রিতেরা এইবার যেন আসিয়া পড়িয়াছে, অথচ এদিকে কোন কিছুর জোগাড় নাই। চারিদিকে মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। অন্ধকার রাত্রির পদধ্বনির মত সহস্রে সহস্রে ছুটাছুটি করিতেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে এখানে-ওখানে কম্পমান ক্ষীণ জ্যোৎস্না, সে যেন মহামহিমার্ণব যাঁরা সব আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গের সিপাহীসৈন্যের বল্লমের সুতীক্ষ্ণ ফলা। নিঃশব্দচারীরা অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শঙ্করকে দেখাইয়া দেখাইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল—এ কে? এ কোথাকার কে—চিনি না ত!

উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শ্রবণশক্তি দিয়া শঙ্কর আরও যেন শুনিতে লাগিল, কিছুদূরে সর্ব্বশেষ সোপানের নিচে কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। কণ্ঠ অনতিস্ফুট, কিন্তু চাপা কান্নার মধ্য দিয়া গলিয়া গলিয়া তার সমস্ত ব্যথা বনভূমির বাতাসের সঙ্গে চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্ধকারলিপ্ত প্রেতের মত গাছেরা মুখে আঙুল দিয়া তাহাকে বারম্বার থামিতে ইসারা করিতেছে—সর্ব্বনাশ করিল, সব জানাজানি হইয়া গেল!···কিন্তু কান্না থামিল না। নিঃশ্বাস রোধ করিয়া ঐ অতল জলতলে চারশ'

বছরের জরাজীর্ণ ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে যে মাধুরীমতী রাজবধূ সারা দিনমান অপেক্ষা করে, গভীর রাতে এইবার সে ঘোমটা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া নিত্যকার মত উৎসবে যোগ দিতে চায়। যেখানে শঙ্কর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল, তাহার কিছু নিচে জলে-ডোবা সিঁড়ির ধাপে মাথা কুটিয়া কুটিয়া বোবার মত সে বড় কান্না কাঁদিতে লাগিল।

তারপর কখন চাঁদ ডুবিয়া দীঘিজল আঁধার হইল, বাতাসও একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, গাছের পাতাটিরও কম্পন নাই—কান্না তখনও চলিতেছে। অতিষ্ঠ হইয়া কাহারা দ্রুতহাতে চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে ঘন কালো পর্দ্দা খাটাইয়া দিতে লাগিল—শঙ্কর বসিয়া থাকে, থাকুক—তাহাকে কিছুই উহারা দেখিতে দিবে না।

আবার টর্চ্চ টিপিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। আলো জ্বলিতে না জ্বলিতে গাছের আড়ালে কি কোথায় সব যেন পলাইয়া গিয়াছে, কোনদিকে কিছু নাই।

তখন শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে কহিতে লাগিল—আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি আর কাঁদিও না, হে লজ্জারুণা রাজবধূ, মৃণালের মত দেহখানি তুমি দীঘির তল হইতে তুলিয়া ধর, আমি তাহা দেখিব না। অন্ধকার রাত্রি, অনাবিষ্কৃত দেশ, অজানিত গিরিগুহা, গভীর অরণ্যভূমি এ সব তোমাদের। অনধিকারের রাজ্যে বসিয়া থাকিয়া তোমাদের ব্যাঘাত ঘটাইয়া কাঁদাইয়া গেলাম, ক্ষমা করিও—

যাইতে যাইতে আবার ভাবিল, কেবল এই সময়টুকুর জন্য কাঁদাইয়া বিদায় লইয়া গেলেও না হয় হইত। তাহা ত নয়।

সে যে ইহাদের একেবারে উদ্বাস্তু করিতে এখানে আসিয়াছে। জরীপ শেষ হইয়া একজনের দখল দিয়া গেলে বন কাটিয়া লোকে এখানে টাকা ফলাইবে। এত নগর-গ্রাম মাঠ-ঘাটেও মানুষের জায়গায় কুলায় না, তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে পৃথিবীতে বন-জঙ্গল এক কাঠা পড়িয়া থাকিতে দিবে না, তাই শঙ্করকে সেনাপতি করিয়া আমিনের দলবল যন্ত্রপাতি নক্সা কাগজপত্র দিয়া ইহাদের এই শত শত বৎসরের শান্ত নিরিবিলি বাসভূমি আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিয়াছে। শাণিত খড়্গের মত ভজহরির সেই সাদা সাদা দাঁত মেলিয়া হাসি—উৎপাত কি আমরা কম করছি হুজুর? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে করে···

কিন্তু মাথার উপরে প্রাচীন বনস্পতিরা ভ্রূকুটি করিয়া যেন কহিতে লাগিল—তাই পারিবে নাকি কোন দিন? আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাল ঠুকিয়া জঙ্গল কাটিতে কাটিতে সামনে ত আগাইতেছে আদিকাল হইতে, পিছনে পিছনে আমরাও তেমনি তোমাদের তাড়াইয়া চলিয়াছি। বন-কাটা রাজ্যে নূতন ঘর তোমরা বাঁধিতে থাক, পুরানো ঘর-বাড়ি আমরা ততক্ষণ দখল করিয়া বসিব।···

হা-হা-হা হা-হা তাহাদেরই হাসির মত আকাশে পাখা ঝাপটাইতে ঝাপটাইতে কালো কালো এক ঝাঁক বাদুড় বনের উপর দিয়া মাঠের উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।···

বনের বাহির হইয়া শঙ্কর ঘোড়ায় চাপিল। ঘোড়া আস্তে আস্তে হাঁটাইয়া ফিরিয়া চলিল। পিছনের বনে ডালে ডালে

ঝাঁক-বাঁধা জোনাকী, আমের গুটি ঝরিতেছে তার টুপটাপ শব্দ, অজানা ফুলের গন্ধ···বারবার পিছন দিকে সে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল। অনেক দূরে কোথায় কুকুর ডাকিতেছে, কাহাদের বাড়ীতে আকাশ-প্রদীপ আকাশের তারার সহিত পাল্লা দিয়া দপদপ করিতেছে···এইবার গিয়া সেই নিরালা তাঁবুর মধ্যে ক্যাম্প-খাটটির উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুম দিতে হইবে! যদি এই সময় মাঠের এই অন্ধকারের মধ্যে সুধারাণী আসিয়া দাঁড়ায়···কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, একপিঠ চুল এলাইয়া টিপিটিপি দুষ্টামির হাসি হাসিতে হাসিতে যদি সুধারাণী ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুই চোখ ভরিয়া তার দিকে তাকাইয়া থাকে···মাথার উপর তারাভরা আকাশ, কোন দিকে কেউ নাই—ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া ফেলিবে, হাত ধরিয়া কঠোর স্বরে শুনাইয়া দিবে কি শুনাইবে সে? শুধু তাহাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিবে—কি করেছি আমি তোমার?···

এই সময়ে হঠাৎ লাফ দিয়া ঘোড়া একটা আ'ল পার হইল। শঙ্করের হুঁশ হইল, এতক্ষণের মধ্যে এখনও গড়খাই পার হয় নাই—জঙ্গল বেড়িয়া ঘোড়া ক্রমাগত ধান-ক্ষেতের উপর দিয়াই চলিয়াছে। জুতা-পায়ে জোরে ঠোকর দিল, আচমকা আঘাত পাইয়া ঘোড়া ছুটিল। গড়খাইয়ের যেন শেষ নাই, যত চলে ততই ধানবন, দিক্ ভুল হইয়া গিয়াছে, মাঠে না উঠিয়া ধানবন ঘুরিয়া মরিতেছে। শঙ্করের মনে হইতে লাগিল, যেমন এখানে সে মজা দেখিতে আসিয়াছিল, ঘোড়াসুদ্ধ তাহাকে ঐ বনের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সমস্ত রাত ছুটিলেও কেবল বন প্রদক্ষিণ করিতে হইবে—নিষ্কৃতি নাই—গড়খাই পার হইয়া মাঠে পৌছান রাত পোহাইবার আগে

খাটিবে না। জেদ চাপিয়া গেল, ঘোড়া জোরে—আরও জোরে—বিদ্যুতের বেগে ছুটাইল, ভাবিল এমনি করিয়া সেই অদৃশ্য ভয়ানক বাঁধন ছিঁড়িবে। আর একটা উঁচু আ'ল, অন্ধকারে ঠাহর হইল না, ছুটিতে ছুটিতে হুমড়ি খাইয়া ঘোড়া সমেত তাহার উপর পড়িল। শঙ্করের মনে হইল, ঘোড়ার পিঠ হইতে ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে আ'লের উপর কে জোরে আছাড় মারিল। তীব্র আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সে নিচে গড়াইয়া পড়িল। ঘোড়াও ভয় পাইয়া গেল, শঙ্করকে মাড়াইয়া ফেলিয়া ঝড়ের মত মাঠে গিয়া উঠিল, শুকনা মাঠের উপর দ্রুতবেগে খুর বাজিতে লাগিল—খটখট খটখট। রাত্রির শেষ প্রহর, আকাশে শুকতারা জ্বলিতেছে। চারশ' বছর আগে যেখানে একদা জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া ছিলেন, সেইখানে অৰ্দ্ধমূর্চ্ছিত শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, সেই জানকীরাম কোন দিক্ হইতে আসিয়া তাহাকে ফেলিয়া ঘোড়া কাড়িয়া লইয়া উত্তর-মাঠের ওপারে তেবরা-বকচরের দিকে চলিয়া যাইতেছেন। ঘোড়ার খুরের শব্দ আঁধার মাঠে ক্রমশ মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

রাজা

※

উড়ো খবর নয়—পোষ্টকার্ডের চিঠি, সুধীর নিজ হাতে লিখিয়াছে—

> "বাবা, বহুদিন আপনাদের কুশল-সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। শনিবার বারটার গাড়িতে বাড়ি পৌঁছিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিব এবং বিস্তারিত সাক্ষাৎমতে নিবেদন করিব।—"

শনিবার অর্থাৎ আগামী কাল। নিবারণ তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে খবর জানাইলেন। পুরা দুইটি বছর অন্তে ছেলে বাড়ি আসিতেছে। ছুটি পায় নাই বলিয়া নহে, বরঞ্চ এতদিন ছুটি ছিল দিবা-রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টাই। চাকরির উমেদারিতে এ-যাবৎ যত হাঁটাহাঁটি করিয়াছে, তাহার সমষ্টিতে বোধকরি পদব্রজে ভারতবর্ষ হইতে ল্যাপল্যাণ্ড অবধি পরিভ্রমণ সারা হইয়া যায়। যাহা হউক চাকরি জুটিয়াছে, ভাল চাকরি—এবং এই প্রথম ছুটি।

পাঁজি খুলিয়া নিবারণ মনোযোগ সহকারে শনিবার তারিখটার গোড়া হইতে আগা অবধি পড়িয়া ফেলিলেন, একটা কিছু পূজাপার্ব্বণ চোখে পড়িল না। ছুটিটা কিসের সাব্যস্ত হইল না। বুধবারে ঈদের বন্ধ আছে বটে, চিঠির তারিখটা শনিবার কি বুধবার লিখিয়াছে—দৃষ্টি-বিভ্রম হইতে পারে, ভাল করিয়া আর একবার মিলাইয়া দেখিতে বালিশের নিচে হাত দিলেন,

তারপর বিছানা উল্টাইয়া ফেলিলেন, তবু চিঠি পাওয়া গেল না। যতদূর মনে পড়ে, বালিশের তলায় রাখা ছিল, তবে যায় কোথায়?

চিঠি তখন চলিয়া গিয়াছে উত্তরের ঘরে বাদামতলার দিককার জানালার কাছে। চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে —চোর কিরণমালা। চার-পাঁচ লাইনের চিঠি, কিন্তু খুকার জ্বালায় কথা কয়টা স্থির হইয়া পড়িবার জো আছে? থাবা দিয়া ধরিতে যায়। অবশেষে ছোট ননদ পটলীকে অনেক খোসামোদ করিয়া তাহার কোলে খুকাকে পাড়ায় পাঠাইয়া দিল। তারপর কিরণ এদিক-ওদিক তাকাইয়া আর একবার সবেমাত্র কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়াছে, আবার বিপদ! শাশুড়া আসিয়া ঢুকিলেন। কিরণ চিঠি ঢাকিয়া ফেলিল। শাশুড়া সেকেলে মানুষ, অতশত দেখেন না: আসিয়াই বলিলেন—বৌমা, বিছানার চাদর ওয়াড়-টোয়াড়গুলো খুলে দাও ত শিগগির—এখন ক্ষারে সেদ্ধ করে রাখি, ভোর থাকতে থাকতে কেচে দেব—কেমন?

বধূ সায় দিয়া বলিল—হাঁ মা, কি রকম বিচ্ছিরি ময়লা হয়ে গেছে, দেখ না—

শাশুড়া বলিলেন—খোকা বারোটার গাড়িতে যদি আসে… তার আগেই সব কেচে দেব। নোংরামি মোটে সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। আর তোমাকেও বলে দিচ্ছি মা, এ রকম পাগলীর মেয়ের মত বেড়াতে পারবে না—কালকে সকাল-সকাল নেয়ে ফিটফাট থেক। যে যেমন চায় তেমনি থাকতে হয়, শহরে-বাজারে থাকে, বোঝ না?

আনন্দে কিরণের বুকের ভিতরে কেমন করিতে লাগিল,

হাসিও পাইল। খোকা—বুড়ো খোকা—অত বড় গোঁফওয়ালা ছেলে, এখনও মা কিনা খোকা বলিয়া ডাকেন!

এদিকে বাহিরে নিবারণের গলা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনাটা এই—নটবর কামার বছর পাঁচ-সাত আগে একখানা বঁটি গড়াইয়া দিয়াছিল, তাহার দরুণ এখনও তিন আনার পয়সা বাকি। উক্ত পয়সার তাগাদা করিতে আসিয়া এমন ভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে যে, তৃতীয় ব্যক্তি কেহ উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয় মনে ভাবিত, ঐ তিন আনার পয়সা এখনই হাতে না পাইলে বেচারা সবংশে নির্ঘাত মারা যাইবে। কিন্তু নিবারণ বহুদর্শী ব্যক্তি, অপরে যে প্রকার ভাবুক—নটবরের জন্য তাঁহার দুশ্চিন্তা হইল না। বলিলেন—রোসো, এইবারে ঠিক—আর একটা দিন মোটে—কাল সুধীর বাড়ি আসবে, কাল আর নয়, পরশু সকালের দিকে এস একবার—পাই-পয়সাটি অবধি হিসেব করে নিয়ে যেও, নাও—কলকেটা ধর—বলিয়া হুঁকা হইতে নটবরের হাতে কলিকা নামাইয়া দিয়া আবার শুরু করিলেন—শোন নি নটবর, বল কি—শোন নি, কানে তুলো দিয়ে থাক না কি? আমার সুধীরের মস্ত বড় চাকরি হয়েছে, দেড়শ' টাকা মাইনে—

কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া বলা নিবারণের অভ্যাস, এ গ্রামের সকলেই ইহা জানে। পাওনাদার এবং আত্মীয়স্বজন বহুবার নিবারণের মুখে শুনিয়াছে—চাকরি ঠিক হয়ে গেছে, এখন সাহেব বিলাত থেকে পৌঁছতে যা দেরি। এবারে আর ভুয়ো নয়, আসছে মাসের পয়লা থেকে নিশ্চয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সাহেব কখনও বিলাত হইতে আসিয়া পৌঁছে নাই এবং মাসের পর মাস অনেক

পহেলাই কালসমুদ্রে তলাইয়া গিয়াছে। সুধীরের চাকরির কথা তাই লোকে বড় বিশ্বাস করে না। তবে এবারের কথা স্বতন্ত্র। দোকানে বসিয়া হাপর টানিতে টানিতে নটবরও যেন কাহার মুখে শুনিয়াছে, সুধীরের ভারী কপাল-জোর, ভাল চাকরি পাইয়াছে। এখন ঐ দেড়শ' টাকার কথা যদি বাদ-সাদ দিয়া অন্তত সত্যকার টাকা পঁচিশেও আসিয়া দাঁড়ায়, তবু নটবরের তিন আনা আদায় হইবার উপায় হইয়াছে। সে পুলকিত হইল।

নিবারণ পুত্রগর্ব্বে স্ফীত হইয়া বলিতে লাগিলেন—সেদিন দাকোপার পাঁচু ঘোষের সঙ্গে দেখা—পিসি আর বৌকে নিয়ে কালীঘাট গিয়েছিল। সুধীর দেখতে পেয়ে এই টানাটানি—বাসায় না নিয়ে ছাড়লই না। পাঁচু বলে—দাদা, বলব কি—মস্ত তিনমহল বাড়ি ভাড়া করেছে, ঝি-চাকর যে কতগুলো গুণে ঠিক করতে পারলাম না। মাইনে দেড়শ' আর উপরি—সকালে আপিসে যায় খালি পকেটে, সন্ধ্যাবেলা দু'পকেট যেন ছিঁড়ে পড়ে। টাকার বোঝা নিয়ে হেঁটে আসতে পারবে কেন, গাড়ি করে ফিরতে হয়। দেখা হলে একবার পাঁচু ঘোষকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

নটবরের গা শির-শির করিয়া উঠিল—এই সেদিনের সুধীর, তাহার দোকানের সামনে দিয়া খালি গায়ে খালি পায়ে জেলেপাড়া হইতে মাছ লইয়া আসিত। বলিল—তা বেশ—বড্ড ভাল কথা, আর আপনার দুঃখ কি চৌধুরী মশাই, রাজ্যেশ্বর ছেলে—

নিবারণ বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—তোমরা পাঁচ জনে ভাল বললেই ভাল। পাঁচু যা বললে—বুঝলে—শুনে তাক লেগে

আয়—পেত্যয় হয় না। রাজরাজড়ার কাণ্ডই বটে। শুনেছ বোধ হয়, এবার আমরা বাড়িসুদ্ধ কলকেতায় চলে যাচ্ছি, সুধীর আসছে সেই সব ঠিকঠাক করতে—

নিবারণ চুপিচুপি কথা বলিবার লোক নহেন, বিশেষত ছেলের এই সৌভাগ্যের কথা। ঘরের ভিতর হইতে কিরণ শুনিতে পাইল, সুধীর দেড়শ' টাকার চাকরি পাইয়া রাজরাজড়ার কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছে। কিরণ একবারও কলিকাতায় যায় নাই এবং সত্যকার রাজারা যে কি প্রকার কাণ্ড করিয়া থাকে তাহাও সঠিক আন্দাজ করিতে পারে না। এ গ্রামে সখের থিয়েটার আছে, অতএব রাজা সে অনেকবার দেখিয়াছে—গায়ে জরির ঝকমকে পোষাক, মাথায় মুকুট। সুধীরের মাথার উপর মুকুট বসাইয়া দিলে কি রকম দেখায় তাহাই সে সকৌতুকে কল্পনা করিতে লাগিল। নিবারণ সত্যবাদী যুধিষ্ঠির নয়, তাহা কিরণ জানে। তবু আজিকার কথাগুলি মিথ্যা বলিয়া ভাবিতে কিছুতেই প্রাণ চাহে না। অনেকবার অনেক আশা করিয়া শেষে সমস্ত মিথ্যা হইয়া গিয়াছে, এবারে মিথ্যা হইলে সে মরিয়া যাইবে। এইটুকু জীবনে সে অনেক দুঃখ পাইয়াছে, সে এক সাতকাণ্ড রামায়ণ। ছেলেবেলায় কিরণের মা মরিয়া গেলে বাবা আবার বিবাহ করেন। নূতন মা কিরণকে মোটে দেখিতে পারিত না, এখন আর তাহাকে বাপের বাড়ি লইয়া যাইবার নামও কেহ করে না।...সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, বাদাম গাছের ফাঁকে চাঁদ উঠিল। কিরণের মনে হইল, যেন কোন্ অনির্দ্দেশ্য স্থানে বসিয়া তাহার অনেক দিনের হারানো মা তাকাইয়া দেখিতেছেন এবং বড় খুশি হইয়াছেন যে, সুধীর রাজা হইয়াছে, আর সে—তাঁহার সেই জন্মদুঃখিনী মেয়ে, এতকালের পর হইয়াছে রাজার পাটরাণী! আয়না

ও চুলের দড়ি পাড়িল ; আবার ভাবিল—দূর হোক্ গে, চুল বাঁধব না আর আজ, বেলা একেবারে গেছে। রান্নাঘরে আসিয়া উনান ধরাইতে গিয়া ভাবিল—এত সকাল সকাল কিসের রান্না! ছেলে-মানুষের মত খিল-খিল করিয়া হাসিতে ইচ্ছা করে, তাহার যেন কি হইয়াছে, তাহাকে ঠিক ভূতে ধরিয়াছে…

পটলী পাড়া বেড়াইয়া আসিয়া খুকীকে কিরণের কোলে ঝপ করিয়া ফেলিয়া দিল। তখনই ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। কিরণ ডাকিল—ও পটলী, যাচ্ছিস কোথা? শোন্—সুশীলাদের বাড়ি গেছলি? তার বর নাকি এসেছে—কলকেতায় বাসা করেছে, তাকে নিয়ে যাবে, সত্যি? পটলী দৃকপাত না করিয়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া উঠানে কুমীর-কুমীর খেলিতে গেল।

উঠানে যেন ডাকাত পড়িয়াছে, পাড়ার ছেলেমেয়েদের কোলাহলে কান পাতা যায় না, পটলী হইয়াছে কুমীর আর উত্তর ও পূব ঘরের দাওয়া হইয়াছে ডাঙা। সেই ডাঙার উপর হইতে উঠানরূপ নদীতে সকলে যেই নাহিতে নামে, পটলী দৌড়াইয়া তাহাদের ধরিতে যায়। রান্নাঘর হইতে মেয়ে কোলে কিরণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।…খুকীর মোটে চারিটা দাঁত উঠিয়াছে, কিরণ খুকীর গালের মধ্যে একবার একটা আঙুল দিয়াছে আর অমনি সে কামড়াইয়া ধরিল।

—ওরে রাক্কুসী ছাড় ছাড়—মরে গেলাম, ভারী যে দাঁতের দেমাক হয়েছে তোমার!

কিরণ হাত ছাড়াইয়া লইল। খুকী হাসিতে লাগিল। কিরণ খুকীর দিকে তাকাইয়া মুখ নাড়িয়া নাড়িয়া বলে—অত হেস না খুকী, অত হেস না। সব মাণিক পড়ে গেল, সব মুক্তো ঝরে

গেল।...মেয়ে মোটে এইটুকু, বুদ্ধি কত—সব বোঝে, চৌকাঠ ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, আবার হাততালি দিয়া বলে—তা—তা—তা—

কিরণ বলিল—হাঁ করে হাবলার মত দেখছ কি? ড্যাবডেবে চোখ মেলে একনজরে কি দেখছ আমার মাণিক? খেলা দেখছ? তুমিও খেলো বড় হও আগে। ঠাণ্ডা হয়ে বাবু হয়ে বোসো তো—এই যে দোলে—দোলে—

দোলন দোলন দুলুনি
রাঙা মাথায় চিরুনি
বর আসবে যখনি
নিয়ে যাবে তখনি—

খুকী তালে তালে কেমন দোলে! কিরণ মেয়েকে মুখের উপর তুলিয়া কচি কচি নরম হাত-বুক-গাল চাপিয়া ধরিতে লাগিল। খুকীর খুব আনন্দ হইয়াছে, মাথা নাড়ে আর টানিয়া টানিয়া বলে—বা-আ-আ—বা—বা। মেয়ে বাবাকে দেখে নাই, সুধীর বাড়ি হইতে যাইবার সময় কেবল মধুর সম্ভাবনার কথাটি জানিয়া গিয়াছিল। কিরণ ফিস-ফিস করিয়া বলিল—খুকী, দেখিস—দেখিস, কালকে বাবা আসবে—তোর খোকা বাবা—মার যেমন কাণ্ড, অত বড় ছেলে এখনও খোকা—হি-হি। ছেলেমানুষের মত হাসিতে লাগিল। তারপর চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, কেহ কোনখান হইতে শুনিতে পায় নাই ত? এমন সোনার চাঁদ তাহার কোলে আসিয়াছে—সুধীর তা জানে না, চোখে দেখে নাই, সুধীরের জন্য মনে করুণা হইল। আবার রাগ হইল—এই ত চিঠিপত্রে

খবর পাইয়াছে, একবার কি এতদিনের মধ্যে মেয়েকে দেখিয়া যাইতেও ইচ্ছা করে না ?

সেইদিন গভীর রাত্রে কিরণ বিছানায় শুইয়া আছে, ঘুম আর আসে না। মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে, দু-তিনবার উঠিয়া মাটির কলসী হইতে জল গড়াইয়া মুখে চোখে দিল। এইবার ঠিক ঘুম আসিবে, চোখ বুজিয়া শুইল। বেড়ার ফাঁকে জ্যোৎস্না আসিয়া অনেকদিন আগেকার স্নেহস্পর্শের মত সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিল। দুই বছর কম সময় নয়।···সুধীরকে গ্রামসুদ্ধ সকলে অকর্ম্মণ্য ঠাওরাইয়াছিল, সেই সঙ্গে কিরণেরও দোষ পড়িয়াছিল, সে নাকি বরকে আঁচল-ছাড়া হইতে দেয় না। শাশুড়ী স্পষ্ট কিছু বলিতেন না, কিন্তু ওর চেয়ে মুখোমুখি লইলেই যে ভাল হইত। শেষাশেষি এমন হইয়াছিল, সুধীর বাড়ি হইতে বাহির হইলে সে বাঁচে। মুখ ফুটিয়া একথা বলিতে সাহস হইত না, কাহাকেও দোষ দিবার উপায় ছিল না, এক এক সময়ে কিরণের মনে হইত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া ওঠে! যেদিন সুধীর রওনা হইল সেদিন সে খুশি হইয়াছিল, এখন সে-সব কথা ভাবিলে বড় কষ্ট হয়। আর লোকটিরও এমন ধনুক-ভাঙা পণ--চাকরি নাই-বা হইল, এতদিনের মধ্যে একবার বাড়ি আসিয়া গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত নাকি ? কিন্তু সে দুঃখের দিন কাটিয়াছে, সুধীর হইয়াছে রাজা, কাজেই কিরণ রাজরাণী—কাল সে বাড়ি আসিবে। কাল এতক্ষণ—

আগামী কাল এতক্ষণ যে কি হইতেছে চক্ষু বুজিয়া সে সেই মনোরম ভাবনা ভাবিতে লাগিল।

ঘরে ঢুকিয়া হয় ত দেখিবে ক্লান্ত সুধীর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, জলের গ্লাসটা খুঁজিতে খুঁজিতে হেরিকেন তুলিয়া কিরণ দেখিয়া লইবে।

আঁলোটা মুখের কাছ দিয়া বার বার ঘুরাইবে, তবু চক্ষু খুলিবে না। পা ধুইয়া জলের ঘটি ঠনাং করিয়া তক্তপোষের নিচে রাখিবে, সজোরে দোরে খিল দিবে, তারপর খুকীর মাথাটা বালিশের উপর সাবধানে তুলিয়া দিয়া মশারি গুঁজিতেছে—

সুধীর আলগোছে একখানা হাত বাড়াইয়া খপ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে।

আসলে সুধীর ঘুমায় নাই, ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া ছিল, কিংবা ঘুমাইলেও ইতিমধ্যে কখন জাগিয়াছে, আগে সাড়া দেয় নাই।

কিরণ বলিবে—বড্ড গরম, চল—দাওয়ায় বসিগে। কেমন ফুটফুটে জ্যোৎস্না, দেখেছ ?

সুধীর হাসিয়া বলিবে—ভয় করবে না ? বাদামগাছে এক পা আর তালগাছে এক পা—ঐ যে মস্ত একটা কি দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ ?

কিরণ বড় ভীতু। বিয়ের কিছুদিন পরে একদিন রাত্রিতে সে রাগ করিয়াছিল, তারপরে সুধীর ভূতের ভয় দেখাইয়া তাহাকে এমন বিপদে ফেলিয়াছিল—সে কথা ভাবিলে হাসি পায়। সে সময়ে কি বোকাই না ছিল!

কিরণ বলিবে—ভয় দেখাচ্ছ, আমায় কচি খুকী পেয়েছ নাকি ?

তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ আসিবে—কক্ষনো না, কচি খুকা ভাবব—সর্ব্বনাশ! কুড়ি পেরুল, বুড়ী হতে আর বাকি কি ?

—এখন আমার মোটেই ভয় করে না—কি দেবে বল, একলা-একলা এখনি খালের ঘাটে চলে যাচ্ছি। তারপর কিরণ

হঠাৎ আর এক কথা জিজ্ঞাসা করিবে—কলকেতায় যে বাসা করেছ, সে নাকি তিনতলা? ছাত থেকে কেল্লা দেখা যায়? গড়ের মাঠ কতদূর? সুশীলার বর যেখানে বাসা করেছে সে বাড়ি চেন? তুমি আপিসে গেলে আমি দুপুরবেলা খুকীকে নিয়ে সুশীলাদের বাসায় বেড়াতে যাব কিন্তু—

অথবা এরূপও হইতে পারে—

হয় ত কাজকর্ম্ম সারিয়া মেয়ে কোলে কিরণ যখন আসিয়া ঢুকিবে, তখন সুধীর শিয়রে আলো রাখিয়া নভেল পড়িতেছে। নভেল পড়া ত ছাই—কিরণকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বই রাখিয়া দিবে, তারপর হাত ধরিয়া বসাইবে। বলিবে—এত দেরি হল? ভাল আছ ত? কই, মেয়ে দেখাও—দেখি—দেখি—

দেখাইবে না ত, মেয়ের মুখ কিরণ কিছুতে দেখাইবে না। কেন, এই যে এত চিঠিপত্র দাও—মেয়ের কথা ভুলিয়াও একবার লিখিয়া থাক? মেয়ে কি গাঙের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে—মেয়ের বুঝি মান নাই!

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখাইতে হইবে। সুধীর পকেট হাতড়াইবে। ও মা, একছড়া খাসা হার চিক-চিক করিতেছে, অতবড় হার ঐটুকু মেয়ের জন্যে! মজা দেখো না, চারটে দাঁত উঠেছে—তিন দিনের ভেতর দস্যি মেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে চেপটা করে দেবে।

বাপ নিজের হাতে মেয়ের গলায় হার পরাইয়া দিবে। কিরণ বলিবে—রাত্তিরটা গলায় থাকুক, কাল সকালে কিন্তু মনে করে হার খুলে নিও—ফের নীল কাগজে মুড়ে ভালমানুষের মত মার হাতে নিয়ে দিও। হ্যাঁগা, তাই করতে হয়—মাকে বোলো, মা এই

তোমার নাতনীর হার নাও—মা খুশি হয়ে খুকীর গলায় পরিয়ে দেবেন, সে কেমন হবে বল ত ?

ঘুমন্ত মেয়ে ন্যাকড়ার মত বাপের বুকে লাগিয়া থাকিবে। সুধার বলিবে—ইঃ, একেবারে যে তোমার মতো হয়েছে—চোখদুটো, গায়ের রং, পায়ের গড়ন, একচুল তফাৎ নেই—

সুখের হাসি হাসিয়া কিরণ বলিবে—কিন্তু নাকটা যে বাপের। বিয়ের সময় ঐ বোঁচা নাকের দাম ধরে দিতে হবে হাজার টাকা।

নাকের উচ্চতা কি পরিমাণ হইলে ঠিক মানানসই হয়, তাহার তর্ক উঠিবে—সে-ই তাহাদের পুরাতন তর্ক।

জ্যোৎস্নামগ্ন চৈত্র-রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাসে ঘরকানাচে বাদামগাছের পত্রমর্মর···ঘুমের ঘোরে খুকীর ছোট্ট বুকখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে···বাহির-বাড়ির ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপের ফাটলে তক্ষক ডাকে, চারিদিকের অতল নিষুপ্তির মধ্যে কিছু সময় অন্তর তাহার রব শোনা যায় কটর্‌র্‌র্ তক্ষ তক্ষ !···বিবাহের পরবর্ত্তী স্বপ্নস্মৃতির টুকরা টুকরা আগামী দিনের মধুর কল্পনার সহিত মিলিয়া সেই রাত্রে একটি নিদ্রাহারা বিমুগ্ধ গ্রামবধূর মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সকালে রোদ না উঠিতেই ননদ-ভাজে খালের ঘাটে গিয়া বাসনের বোঝা নামাইল। বাসন-মাজা ত উপলক্ষ, কেবল গল্প আর গল্প—এমনি করিয়া উহারা রোজ এক প্রহর বেলা কাটাইয়া আসে। স্টেশন হইতে সাঁকো পার হইয়া গ্রামে আসিতে হয়। কিরণ সাঁকো পিছন করিয়া বাসন মাজিতেছিল, হঠাৎ পটলী চেঁচাইয়া উঠিল—ও মা, এত সকালে এসে পড়ল ? তাড়াতাড়ি

এঁটো হাতেই কিরণ ঘোমটা টানিল। পটলী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

— ও বৌদি, কলাবৌ সাজলি কেন? আমি কার কথা বললাম? আসছে আমাদের মুংলি গাইটা।

মুংলি গরু আসিতেছিল ঠিক, কিন্তু পটলী যে ভঙ্গি করিয়া বলিয়াছিল, সেটা মুংলির সম্পর্কে নিশ্চয় নয়। পোড়ারমুখী মেয়ে এই বয়সে এমন পাকা হইয়াছে!

কিরণ বলিল — তাই বই কি! তুমি বড্ড ইয়ে হয়েছ, গুরুজনের সঙ্গে ঠাট্টা—তোমায় দেখাচ্ছি—বলিয়া বড় রাগিয়া শাসন করিতে গিয়া পারিল না, শাসন করিবে, না হাসি চাপিবে?

এদিকে নিবারণ ভারী ব্যস্ত। উঠিয়া আগে বেড়ার গায়ে ছাতিমগাছের কয়েকটা ডাল ছাঁটিয়া দিলেন, পথটা যেন আঁধার করিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর নিশি গাঙ্গুলীর বাড়ি গিয়া বলিলেন — একটা টাকা হাওলাত দিতে পার, গাঙ্গুলী? কালকে নিও—

গাঙ্গুলী নিরাপত্তিতে টাকা বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন— সুধীর বাবাজী আজ আসছেন বুঝি! বাজারে যাচ্ছ? সাজা তামাকটা খেয়ে যাও, বেলা হয়নি। আর আমার কথাটা মনে আছে ত?

নিশি গাঙ্গুলীর কথাটা হইতেছে, সুধীরকে বলিয়া তাহার আপিসে বা অন্য কোথাও মেজ ছেলে হেমন্তর একটা চাকরি করিয়া দিতে হইবে। তামাক খাইয়া এবং গাঙ্গুলীকে বিশেষ প্রকারে আশ্বাস দিয়া নিবারণ উঠিলেন।

বাজারে মাছ কিনিতে গিয়া বিষম বিভ্রাট। চারিটা সরপুঁটি আসিয়াছে, তাহার ন্যায্য দর চার আনার বেশি এক আধেলাও নয়।

নিতান্ত গরজ বলিয়া পাঁচ আনা অবধি দর দিয়া নিবারণ ঘণ্টাখানেক ধন্না দিয়া বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে খোসামোদ চলিতেছে—ও পাড়ুয়ের পো, তুলে দে—অলেজ্য দর হয় নি। ছেলে বাড়ি আসবে, বড় চাকরে—আমাদের মত কচুঘেঁচু দিয়ে খাওয়া ত অভ্যেস নেই। দে বাবা, তুলে দে—। কিন্তু পাড়ুয়ের পুত্র কিছুতেই ভিজিতেছিল না। এমন সময়ে অক্রূর মোড়ল আট আনা বলিয়া ধাঁ করিয়া মাছ ক'টা তুলিয়া লইল। নিবারণ একেবারে মারমুখী। অক্রূরও ছাড়িবে কেন—গত কল্য মণ দশেক গুড় বেচিয়াছে, গুড়ের দর যাহাই হউক, একসঙ্গে অতগুলি টাকা গাটে থাকায় তাহার মেজাজ ভিন্ন প্রকার।

গ্রামের জনকয়েক নিবারণকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া হাত ধরিয়া ভিড়ের ভিতর হইতে সরাইয়া লইয়া গেল। কিন্তু নিবারণের রাগ মিটে নাই—ছোটলোকের এত আস্পর্দ্ধা—আসুক সুধীর, দেখা যাইবে কত ধানে কত চাল!—

সুধীর যখন পৌঁছিল তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। আজ আর আসিল না সাব্যস্ত করিয়া বাড়িসুদ্ধ সকলের খাওয়া-দাওয়া সারা হইয়াছে, কিরণ এইবার চারিটা মুখে দিবে। কি মনে করিয়া ও-ঘরে যাইতেছিল, এমন সময়ে দেখিল সাঁকোর উপর একটা ছাতি, শেষে আরও ভাল করিয়া দেখিল। তারপরে রান্নাঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

সুধীর আসিয়া ডাকিল—মা, ও মা, কোথায় সব?

সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে, টিনের একটি সুটকেস স্টেশন হইতে

নিজেই বহিয়া আনিয়াছে, কলিকাতার বাসায় যে অগুন্তি চাকরবাকর তাহার একটাও সঙ্গে আনে নাই।

মা আসিয়া পাখা করিতে লাগিলেন। পটলী খুকীকে কোলে লইয়া সামনে দাঁড়াইল। সুধীর এক নজর চাহিয়া দেখিল, চেহারা মলিন রুক্ষ—সে শ্রী নাই, হয় ত চাকরির খাটুনিতে, তাহার উপর পথের কষ্ট।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া একটু জিরাইবারও অবকাশ হইল না, ইতিমধ্যে গ্রামের হিতাকাঙ্ক্ষীরা আসিয়াছেন। শ্রীদাম মল্লিক সকলের চেয়ে প্রবীণ, সুধীর সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। মল্লিক মহাশয় বলিলেন—শুনলাম সব কথা নিবারণের কাছে, শুনে যে কি আনন্দ হল! এখন বেঁচেবর্ত্তে থাক, অখণ্ড পরমাই হোক! বুড়ো বাপমাকে এইবারই নিয়ে যাচ্ছ ত? নিয়ে যাবে বই কি! গঙ্গায় চান করবে, হরিনাম করবে, এর চেয়ে আর ভাগ্যির কথা কি? আমাদের পোড়া কপাল—আমরাই পড়ে রইলাম পচা ডোবায়—বলিয়া একটি নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

ভগবতী আচার্য্য কিঞ্চিৎ হস্তরেখাদি বিচার ও ফলিত-জ্যোতিষের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। বলিলেন—বলেছিলাম কিনা নিবারণ-দা, বৃহস্পতি তুঙ্গী—তোমার সুধীর রাজা হবে। ঊর্দ্ধরেখা আঙুলের গোড়া অবধি চলে এসেছে—বলি নি?

নিবারণের সে কথা মনে পড়ে না, কিন্তু ঘাড় নাড়িলেন।

নিশি গাঙ্গুলীও আসিয়াছিলেন। বলিলেন—বাবাজী, আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যের পর একবার অবিশ্যি করে যেও—তোমার খুড়ীমা ডেকেছেন—

অমনি ড্রামাটিক-ক্লাবের ছেলেরা সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল—সে কি করে হবে? সন্ধ্যের পর সুধীরবাবু আমাদের রিহার্শাল দেখতে যাবেন যে। ওঁকেই এবার ক্লাবের সেক্রেটারি করা হবে—কালকে আমরা মিটিং করব।

সুধীর সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—সেক্রেটারি আমাকে কেন? আমাকে বাদ দাও, আমি থিয়েটারের কিছু বুঝি নে।

দলের একজন বলিল—তাতে কি হয়েছে, আমরাই সব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দেব। এই ধরুন, আপাতত উদ্যান দুর্গ আর অন্তঃপুর-সংলগ্ন প্রাসাদ এই তিনটে সিন, গোটা পাচেক চুল-দাড়ি, দুটো রয়াল ড্রেস আর একটা হারমোনিয়ম কিনে দিবেন—ব্যস। আমাদের নারদ যে কি চমৎকার গান গায় শুনলে অবাক হয়ে যাবেন—কিন্তু দুঃখের কথা কি বলব, জুৎসই একটা দাড়ির অভাবে অমন প্লেটা নামাতে পারছি নে।

গাঙ্গুলী পুনশ্চ বলিলেন—যেমন করে হোক একবার যেতেই হবে বাবাজী, নইলে তোমার খুড়ীমা ভারী কষ্ট পাবে। সারাদিন বসে বসে চন্দোরপুলি বানিয়েছে। আমি হেমন্তকে পাঠিয়ে দেব, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

অনেকের অনেকপ্রকার আবেদন, সুধীর উঠিল। জামা গায়ে দিবার জন্যে ঘরে ঢুকিয়া দেখে, সেখানে মাত্র একটি প্রাণী—একলা কিরণ চুল বাঁধিতেছে। কিরণের বুকের ভিতর ঢিপ-ঢিপ করিতে লাগিল, যে দুষ্ট এই সুধীর!...কিন্তু তাহার সে দুষ্টামি আর নাই ত! শান্ত ভাবে জামাটা পাড়িয়া গায়ে দিল, একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। ভাবখানা এমন, যেন তাহারা দু'টিতে বরাবর বার মাস একসঙ্গে ঘর-গৃহস্থালী করিয়া আসিতেছে।

পটলী খুকীকে আনিয়া বলিল—দাদা, একবার কোলে নাও না—দেখ, তোমায় দেখে কেমন করছে। সুধীর দাঁড়াইল, একবার হাসিয়া মেয়ের দিকে তাকাইল, তারপর কহিল—এখন বড় ব্যস্ত রে। সব দাঁড়িয়ে রয়েছেন—থাকগে এখন।

ড্রাম্যাটিক-ক্লাবের যতগুলি লোক কেহই কলিকাতাবাসী ভাবী-সেক্রেটারির সম্মুখে গুণপনার পরিচয় দিতে ক্রুটি করিল না। ফলে রিহার্শল যখন থামিল, তখন চাঁদ মাথার উপরে। নারদ যাবার মুখেও একবার দাড়ির তাগাদা দিল। সুধীর বলিল—ব্যস্ত হবেন না, কালকের মিটিঙে একটা এস্টিমেট ঠিক হবে।

দু-তিনজন আসিয়া সুধীরকে বাড়ি অবধি পৌছাইয়া দিয়া গেল।

দোরে খিল আঁটা, একটা জানালা খোলা ছিল। সুধীর দেখিল—মিট-মিট করিয়া হেরিকেন জ্বলিতেছে, থালায় ও বাটিতে ভাত-ব্যঞ্জন ঢাকা দেওয়া এবং ঠিক তাহার পাশেই মাটির মেঝেয় কিরণ ঘুমাইয়া আছে। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া অবশেষে বেচারী ওখানেই শুইয়া পড়িয়াছে। মনটা কেমন করিয়া উঠিল, ডাকিল—কিরণ, ও কিরণ—

দু-বছর আগেকার সেই ডাক একেবারে ভুলিয়া যায় নাই ত!

কিরণ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দোর খুলিয়া দিল। সুধীর বলিল—তাড়াতাড়ি করছ কেন, বোসোই না। ভাতের দরকার নেই, গাঙ্গুলী-গিন্নীর যা কাণ্ড—তিন দিন না খেলেও ক্ষতি হবে না।

কিরণ মৃদু হাসিয়া বলিল—তিন দিন থাকছ ত? বাবাকে আজ আসবার জন্যে লিখে দিলাম, পত্তোর পেয়ে মঙ্গলবার নাগাদ ঠিক এসে পড়বেন—এ তিনটে দিন থাকতে হবে কিন্তু।

সুধীর বলিল - মোটে তিন দিন? এরি মধ্যে তাড়াতে চাও, ভারী নিষ্ঠুর ত তুমি! তিন মাসের কম নড়ছিনে—দেখে নিও—

—আচ্ছা, আচ্ছা—দেখব। কিরণ মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।—আর বড়াই কোরো না, মায়া-দয়া সব বোঝা গেছে। আমরা না-হয় পর, নিজের মেয়েকেও কি একটিবার চোখের দেখা দেখতে ইচ্ছে করে না?

সুধীর বলিল - সে কথা ত বলবেই কিরণ, তার সাক্ষী ভগবান। তারপর মুখখানা অতিশয় ম্লান করিয়া কহিতে লাগিল— শরীরের কি হাল হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ ত? ছ-বছর যা কেটেছে, অতিবড় শত্তুরের তেমন না হয়। জায়গা না পেয়ে একেরকম রাস্তার ফুটপাথে শুয়ে কাটিয়েছি—এক পয়সার মুড়ি খেয়ে দিন কেটেছে, ক'দিন তাও জোটে নি। ভাগ্যিস রাস্তার কলের জলে পয়সা লাগে না—

কিরণের চোখ ছল-ছল করিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি বলিল— থাকগে, তুমি থাম। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—যে দুঃখ কপালে লেখা ছিল তা যাবে কোথায়? সে ছাইভস্ম ভেবে আর কি হবে বল।

দু'জনে স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকাইয়া আবার কিরণের হাসি ফুটিল।—ওগো, তুমি খুকীকে দেখলে না? এমন দুষ্টু হয়েছে—ঐটুকু মেয়ে, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি—

সুধীর কহিল—দেখব না কেন? দেখছি ত।

কিরণ যেন কত বড় গিন্নী, তেমনি সুরে কহিল—ও আমার কপাল, ঐ রকম দেখলে হয় নাকি? মেয়ে আমার সঙ্গে কত দুঃখ করছিল—বাবা আমায় কোলে নিলে না, আদর করলে না…তুমি

খুকীকে একটা সরু হার গড়িয়ে দিও—নির্ম্মলা-দিদির মেয়েকে দিয়েছে, খাসা দেখায়—

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—মেয়ে কথা বলতে শিখেছে নাকি?

—বলে না? সব কথা বলে, সে কি আর তোমরা বুঝতে পার? বলিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর আবার শুরু করিল—সেদিন বলছিল, বাবাকে একখানা ঠেলা গাড়ি কিনে দিতে বোলো—তাই চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খাব।

সুধীরও হাসিল, বলিল—বটে, আবার গড়ের মাঠের শখ হয়েছে?

—কেন অন্যায়টা কিসের? খালি খালি চুপটি করে বাসায় বসে থাকবে বুঝি! তুমি ভাব, আমরা কিচ্ছু জানি নে। আমাকে না লিখলে কি হয়, শ্বশুরঠাকুর সব রাষ্ট্র করে দিয়েছেন।

—কি শুনেছ বল ত?

—মস্তবড় বাড়ি ভাড়া করেছ, আমাদের সবাইকে নিয়ে যাচ্ছ—কোনটা শুনি নি? তাই তাড়াতাড়ি বাবাকে আসবার জন্য চিঠি দিলাম, যাবার আগে একটিবার দেখা করে যাই—কতদিন দেখা হবে না।

সুধীরের মুখ অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া গেল। বলিল—এ সব মিছে কথা কিরণ—

—কি মিছে কথা?

—এই বাসা করার কথা-টথা। মতলব করেছিলাম বটে, কিন্তু সে সব আর হবে না।

কিরণ বলিল—কেন হবে না—আলবৎ হবে। মাইনে-খাওয়া লোকে কখনও যত্ন করে? তোমার শরীরের দশা দেখে যে কান্না

পায়! আমি তোমাকে কখনও একলা ছেড়ে দেব না।

—কিন্তু খরচ চালাব কোত্থেকে?

—ওঃ! বলিয়া কিরণ গম্ভীর হইল।

—কথা বল না যে!

কিরণ কহিল—আমার খরচ বড্ড বেশি, আমায় নিয়ে কাজ নেই। বেশ ত, মাকে নিয়ে যাও। আমি যাব না, কক্ষণো তোমার বাসায় যাব না, এই বলে দিলাম। বলিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইল।

সুধীর বলিল—রাগ হল? কতদিন বাদে এসেছি, আর এই রকম কষ্ট দিচ্ছ?

—আমি কষ্ট দিই, আর ত কেউ কাউকে দেয় না, সেই ভাল। বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিল—ড়-বছরের মধ্যে ক'খানা চিঠি দিয়েছ? দশখানা কি এগারোখানা। সব বেঁধে ঐ বাক্সের মধ্যে রেখে দিইছি। বিকেলবেলা এসেছ, তখন থেকেই ভাব দেখছি। বুঝি—বুঝি—সব বুঝি। কিরণ চোখ মুছিল।

সুধীর বলিল—বললে ত বিশ্বেস করবে না, আমি কি করব?

—কি আর করবে—তিনমহল বাড়ির ভাড়া জোটে, চাকর-বাকরের মাইনে জোটে, সব জোটে, কেবল—থাকগে। বলিতে বলিতে কিরণ চুপ করিল।

—তিনমহল বাড়ি ভাড়া করেছি আমি?

কিরণ বলিল—হ্যাঁগো, আমি সব জানি। তিন মহল বাড়ি ভাড়া করেছ, দেড়শ' টাকা মাইনে পাচ্ছ—লুকচ্ছ কেন?

সুধীর বলিল—না, লুকব না—আর কি জান বল ত—

—মাইনে ছাড়া উপরি পাও, রোজ টাকার আর নোটে পকেট ভর্ত্তি হয়ে যায়—বল ঠিক কি-না ?

সুধীর বলিল—ঠিক !

—ঢাকছিলে যে বড় !

সুধীর হাসিল। বলিল—দেখছিলাম, তোমরা কে কি রকম দরদি—অভাবের কথা শুনে কে কি বল। বাসা ভাড়া হয়ে গেছে কিরণ, নিয়ে যাব না ত কি ? তোমাদের সব্বাইকে নিয়ে যাব।

কিরণ রুখিয়া বলিল—আমি যাব না, কক্ষনো যাব না—বলেছি ত। খুকীকে কোলে নিলে না, বিকেল থেকে একটিবার হাসছ না, দুঃখটা কিসের শুনি ? টাকাকড়ি হয়েছে—ছাই টাকা, আমরা তোমার টাকা চাই নে।

তখনও ম্লান হাসি ঠোঁটের উপর ছিল। সুধীর বলিল—এই যে কত হাসছি, দেখছ না ? এত ঝগড়াও করতে পার তুমি, তোমার ও-স্বভাবটা আর বদলাল না !

—তোমার স্বভাব বদলেছে, সেই ভাল।

বধূর হাত ধরিয়া টানিয়া সুধীর বলিল—সত্যি, আর রাগারাগি নয়—আজকে সারাদিন বড় কষ্ট গিয়েছে।

কিরণ বলিল—তবু ত এক দণ্ড জিরোন নেই, এই এতখানি রাত অবধি—

—কি করব বল ? গাঙ্গুলীমশায় নাছোড়বান্দা—ছেলের চাকরি করে দিতে হবে। বলে এলাম, হেমন্তকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যাব। কেশব ঘোষ, রাম মিত্তির, তারক চক্কোত্তি, সকলের চার

সনের খাজনা বাকি—তার কড়াক্রান্তি হিসেব হয়ে গেল—কাল সকালে সব আসবেন—মিটিয়ে দিতে হবে। শ্রীদাম মল্লিক মশাই আপ্যায়ন করে বসিয়ে ঠিকানা টুকে নিলেন, গঙ্গাস্নানের যোগে সপরিবারে আমার বাসায় পায়ের ধলো দেবেন। ক্লাবের ছেলেরা কাল মিটিং করবে, তাদের সিন-ড্রেসের এস্টিমেট হবে। বড়লোকের হাঙ্গামা কত! সবারই গরজ বেশি, কেউ ছাড়েন না, অব্যাহতি কোথায়?

এই সব বাজে কথা শুনিতে কিরণের মন চাহিতেছিল না।

—বেশ করেছ—বড় কাজ করেছ—বলিয়া হঠাৎ ঘুমন্ত মেয়েকে বিছানা হইতে টানিয়া তুলিয়া হাসিতে হাসিতে হুকুমের সুরে বলিল—মেয়ে কোলে নাও—তোমার মত মোটেই নয়, দেখ ত কেমন। নাও—

সুধীর কিন্তু উৎসাহ প্রকাশ করিল না, বলিল—আবার জেগে উঠে এক্ষুনি কান্নাকাটি শুরু করবে—এ-সব কাল হবে। ভারী ঘুম পাচ্ছে, আমি এখন শুই—

ঠিক তাহার ঘণ্টা দুই পরে সুধীর খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। হেরিকেনের জোর কমানো ছিল, উস্কাইয়া দিয়া দেখিল—মেয়ের পাশে কিরণ বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে। একখানা চিঠি লিখিল—

> কিরণ, আমার সম্বন্ধে কিছু ভুল শুনিয়াছিলে। চাকরি পাইয়াছিলাম, তবে মাহিনা দেড়শ' নয়—চল্লিশ টাকা। বাসা ভাড়া করিয়াছিলাম—উহা তিনতলা নয়, পাকা মেঝে, চাঁচের বেড়া, টিনের ঘর। কিন্তু বাজার মন্দা বলিয়া আজ সাত দিন চাকরির জবাব হইয়াছে। তোমাদিগকে লইয়া একসঙ্গে থাকিব এই আশায় বাসা ভাড়া করিয়াছিলাম, কিন্তু যে অর্দ্ধেক ভাড়া

অগ্রিম দিতে হইয়াছিল সেইটাই লোকসান। দু-বছর যে কষ্টে গিয়াছে তাহা ভগবান জানেন। শহরে বসিয়া আর উঞ্ছবৃত্তি করিতে পারি না, তাই দু-দিন জিরাইতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা এবং গ্রামসুদ্ধ সকল ইতর-ভদ্রে চক্রান্ত করিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিলে। আজ দিনরাত্রির মধ্যে আমার অবস্থা মুখ ফুটিয়া কাহারও কাছে বলিতে পারিলাম না, তাই চিঠি রাখিয়া পলাইলাম।

এই মাসের মাহিনার মধ্যে হোটেল-খরচ, বাসা-ভাড়া, আপিস-দারোয়ানের দেনা এবং বাড়ি আসিবার ট্রেন-ভাড়া বাদে সম্প্রতি হাতে এগার টাকা বার আনা আছে। চিঠির সঙ্গে একখানা দশ টাকার নোট গাঁথিয়া রাখিয়া যাইতেছি। উহা হইতে খুকীর জন্ম গিনি সোনার হার, কেশব ঘোষ প্রভৃতির খাজনা শোধ, ড্রামাটিক-ক্লাবের সিন-ড্রেস, গাঙ্গুলী-পুত্রের কলিকাতার রাহা খরচ এবং মা বাবা ও তোমার যদি অপর কোন সাধ-বাসনা থাকে সমাধা করিও। আমার জন্ম চিন্তা নাই—নগদ সাত সিকা লইয়া রওনা হইলাম।

পরদিন নিবারণ বলিতে লাগিলেন—আপিসের কাজে ঐ ত মুশকিল—দুপুর রাত্রে টেলিগ্রাম এসে হাজির, ভোর বেলা ইস্টিশানে পৌঁছে দিয়ে এলাম। ওকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে সাহেবের বিশ্বাস নেই—আপিসের হেড কিনা—

বাঘ

※

বনকাপাসী গ্রামে এ রকম অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার কোন দিন ঘটে নাই।

সকালবেলা তিনকড়ি বাঁড়ুয্যে মহাশয় গাড়ু হাতে বাঁশবাগানের মধ্যে যাইতেছিলেন, এমন সময় যেন কেঁদো-বাঘ ডাকিয়া উঠিল। বাঁড়ুয্যে গাড়ু ফেলিয়া তিন লাফে বাগান পার হইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। ডাকটা কোন দিক্ হইতে আসিল তাহা সঠিক সাব্যস্ত করিতে পারিলেন না। কোন দিকে যে চূড়ান্ত নিরাপদ জায়গা তাহা নিরূপণ করিবার জন্ত এদিক ওদিক তাকাইতেছেন, এমন সময় দেখা গেল জাল কাঁধে ছিদাম মালো উত্তর-মুখো বিলের দিকে চলিয়াছে।

—শুনিস নি ছিদাম?

ছিদাম কিছু শুনিতে পায় নাই।

—শেষকালে দিনমানেও কেঁদো ডাকতে আরম্ভ করল! বিলকোলাচে পাতি-বনের দিক্‌টায়—। কথার মাঝখানেই পুনরায় বাঘের ডাক এবং যেন আরও একটু নিকটে।

ছিদামের মাছ ধরা হইল না, ফিরিল—পাগুলি একটু ঘন ঘন ফেলিয়াই। বাড়ুয্যে মহাশয়ের বয়স হইয়াছে এবং বাতের দোষ আছে, তিনি ত দৌড়াইতে পারেন না—

কোন গতিকে মিত্তিরদের চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে উঠিয়া দেখিলেন, এক পাশে পাইক নিমাই বৈরাগী হুঁকা শোধন করিতেছে এবং ভিতরে রাম মিত্তিরের সেজ ছেলে বুধো তারক চক্কোত্তির সঙ্গে দাবা খেলিতেছে। বাঁড়ুয্যে বাঘের বিবরণ আদ্যোপান্ত বলিলেন। তিন জনেই জোয়ান। বুধো এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর হইতে সড়কি বাহির করিয়া আনিল, নিমাই পাইক লইল তাহার পাঁচহাতি লাঠি, এবং হাতের কাছে জুতসই আর কোনো অস্ত্র না দেখিয়া তারক চক্কোত্তি একটানে একটা জিওলের বড় ডাল ভাঙিয়া কাঁধে করিল।

তিন বীরপুরুষ বাহির হইয়া পড়িল—আগে তারক, মাঝে বুধো, শেষে নিমাই।

ঐ—ঐ—আবার বাঘ ডাকে।

একেবারে পাড়ার মধ্যে! দীঘির পাড়ে কিংবা হলুদভূঁইয়ের মধ্যে। সর্ব্বনাশ—দিন দুপুরে হইল কি! তারক পিছাইয়া পড়িল। মাত্র জিওলের ডাল সম্বল করিয়া গোয়ার্ত্তুমিটা কিছু নয়। নিমাই কহিল—ফেরা যাক সেজ কর্ত্তা, পাড়ার সবাইকে ডেকে আনি—

বুধো তাড়া দিয়া উঠিল। কিন্তু আর আগাইল না, সড়কিটা শক্ত করিয়া ধরিয়া সন্তর্পণে সেখানে দাঁড়াইল।

ঐ—ফের।

একেবারে আসিয়া পড়িয়াছে। আমবাগানের আড়ালে—দশ হাতও হইবে না। বাবা রে! তারক ও নিমাই দৌড় দিল। বুধো একা একা কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না, এমন সময়ে মোড় ঘুরিয়া সামনে আসিয়া পড়িল—

বাঘ নয়, দু-জন মানুষ!

বাঘ

একজনের মাথার উপরে চৌকা লালচে রঙের কাঠের ছোট বাক্স, বাক্সের উপর গামছায় বাঁধা পুঁটুলি। অপরের বাঁ হাতে হুঁকা, ডান হাতে অবিকল ধুতুরাফুলের মত গড়নের বৃহদাকার একটি চোঙা। সেই চোঙা এক একবার মুখে লাগাইয়া শব্দ করিতেছে, আর যেন সত্যকার বাঘের আওয়াজ হইতেছে।

বুধো লোক দুইটিকে সঙ্গে লইয়া বাহিরের উঠানে দাঁড়াইল।

বাঁড়ুয্যে তখনও সেখানে ছিলেন। ইতিমধ্যে গ্রামের আরও দু'চারজন জুটিয়াছে। বাঘের গল্প হইতেছে—পাঠশালায় পড়িবার সময় একবার বাঁশের বাড়ি দিয়া ঘনশ্যাম মিত্তির একটা গোবাঘার সামনের দাঁত ভাঙিয়া দিয়াছিলেন—সেই সব অনেককালের কথা। গল্প ভাল জমিয়াছে, এমন সময়ে উহারা আসিল।

—কি আছে তোমাদের ওতে ?

—গ্রামোফোন—গান আছে, একটো আছে, সাহেব-মেমের হাসি—একেবারে যেন ঠিক সত্যি, ছাদ ফেটে যাবে মশাই—

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—তুমি আর নতুন কি শোনাবে বাপু! আমাদের এই গাঁয়ে যাত্রা বল, আর ঢপ কবি বৈঠকি বল, কোন কিছু বাকি নেই। গেলবারেও ঠাকুরবাড়ি যাত্রা হয়ে গেল—নীলকণ্ঠ দাসের দল। নীলকণ্ঠ দাসের নাম শোন নি—হাকোবার নীলকণ্ঠ ?

রাম মিত্তির বলিলেন—সাহেব মেম ত ইংরাজিতে হাসে। ও ইংরাজি-মিংরাজি আমরা কেউ বুঝতে পারব না। তবে গান একটো-তা তুমি কি একলাই সব কর ? কিসের দল বললে তোমার ?

চোঙা-হাতে লোকটি বলিল—গ্রামোফোন—কলের গান।

আমি কিছু করব না মশাই, সব এই কল দিয়ে করাব—বলিয়া সে সঙ্গীর মাথার বাক্সটি দেখাইল।

প্রিয়নাথ থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া তামাক খাইতেছিল। গ্রামসুবাদে রাম মিত্তিরের ভাইপো বলিয়া তাহার সামনে তামাক খায় না। একটা শেষ টান মারিয়া একটু আগাইয়া হুঁকাটা অশ্বিনী শীলের হাতে দিয়া সে বলিল—তোমার ঐ বাক্স একটো করবে? কাঠে কখনো কথা কয়? মন্তোর-তন্তোর জান নাকি?

বামুনপাড়ার নিত্যঠাকরুণ দীঘির ঘাটে স্নান করিয়া ঘড়া কাঁখে ঘটি হাতে সবেগে মন্ত্র পড়িতে পড়িতে পথের সকল অশুচিতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। কথাটা তাঁহার কানে গেল। মন্ত্র থামাইলেন না, কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বৃত্তান্তটা শুনিলেন।

এ-পাড়া ও-পাড়ায় অবিলম্বে রাষ্ট্র হইয়া গেল—মিত্তিরবাড়ি এক আশ্চর্য্য কল আসিয়াছে, তাহা মানুষের মত গান গায় ও একটো করে। খুকীরা এবং যেসব ছেলে পাঠশালায় যায় না সকলেই ছুটিল। যাহাদের বয়স হইয়াছে তাহারা অবশ্য এমন গাঁজাখুরি গল্প বিশ্বাস করিল না—তবু দেখিতে গেল।

চোঙাওয়ালা লোকটার নাম হরসিত—জাতে পরামানিক। উঠানে বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে। সে কিন্তু নিতান্তই নিস্পৃহভাবে তামাক খাইতেছে; এত যে লোক জমিয়াছে তাহার যেন নজরেই আসিতেছে না। চক্কোত্তিদের বুঁচি খানিক আগে আসিয়াছে। আঙুল দিয়া টেঁপিকে দেখাইয়া দিল, ঐ সে কল। কিন্তু টেঁপিকে বোকা বুঝাইলেই হইল! ছোট চৌকা কাঠের বাক্স—উহাই নাকি আবার গান গায়, যাঃ!

হরসিত চোখ বুজিয়া হুঁকা টানিয়া টানিয়া তামাকের ধোঁয়ায়

পৌষ মাসের সকালবেলার মত চারিদিকে নিবিড় কুয়াসা জমাইয়া তুলিল। এ যেন আরব্য উপন্যাসের সেই কলসীর ভিতর হইতে দৈত্য বাহির হওয়া—কেবলই ধোঁয়া, ধোঁয়া—তার মধ্যে হরসিতের আবছা মূর্ত্তি! এইবার বুঝি প্রচণ্ড লাফ দিয়া একটা অত্যদ্ভুত কিছু করিয়া বসিবে। কিন্তু সে তাহা কিছু না করিয়া সহসা হুঁকার ভুড়ভুড়ি থামাইল এবং চোখ খুলিয়া বলিল—তামাক যে বড় ফ্যাকসা মশাই, গলায় সেঁকও লাগে না। অমনি জন দুই ছুটিল কামারপাড়ায় যাদবের বাড়ি, সে গাঁজা খায়, তাহার কাছে গলা সেঁকিবার উপযুক্ত একছিলিম তামাক মিলিতে পারে।

সকলে রাম মিস্ত্রিকে ধরিয়া বসিল—তুমি কায়েতদের সমাজপতি, এ গান তোমাকে দিতে হবে। রাম মিস্ত্রির হইয়া সকলে দর কসাকসি আরম্ভ করিল। টাকায় আটখানি করিয়া গান, দু-টাকায় সতেরো খানা অবধি হইতে পারে—তার বেশি নয়। একটোর দর অন্যত্র হইলে বেশি হইত, কিন্তু এতগুলি ভদ্রলোক যখন বলিতেছেন তখন তা আর কাজ নাই। মোটের উপর হরসিতের বিবেচনা আছে। এক টাকায় নয়খানি রফা হইল।

তখন পকেট হইতে একটা চকচকে গোলাকার বস্তু, হাতল, কাঁটার কৌটা প্রভৃতি বাহির করিয়া ধাঁ-ধাঁ করিয়া চৌকা বাক্সে হরসিত সেগুলি পরাইয়া ফেলিল, চোঙাটিও বাক্সের গায়ে বসাইল। তারপর গামছার পুঁটুলি খুলিয়া হাত-আয়না চিরুনি ও কাপড় সরাইয়া বাহির করিল কালো কালো পাতলা পাথর—

কাহারও আর নিঃশ্বাস পড়ে না।

হাতল ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—বায়নার টাকা দিন। অগ্রিম দেবেন না, বলেন কি মশাই? আমার সাহেববাড়ির কল—

থালায় করিয়া টাকাটি আসরের ঠিক মধ্যস্থলেই রাখা হইল, যে-যে পেলা দিতে চাহিবে, তাহাদের কাহারও যাহাতে কোনো অসুবিধা না হয়। তারপর হরসিত কলের উপর একখানা পাথর বসাইয়া কি টিপিয়া দিল, আর পাথর চরকির মত ঘুরিতে লাগিল। তারপর সেই ঘুরন্ত পাথরে যেই আর একটা মাথা বসাইয়া দেওয়া, অমনি একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল—তবলা, বেহালা, ইংরাজি বাজনা, ঢোল, করতাল—বোধকরি পৃথিবীতে সুর-যন্ত্র যা-কিছু আছে সবগুলিই।

ইতিমধ্যে হৈ-হৈ করিয়া একপাল ছেলে আসিয়া পড়িল, এই উপলক্ষে পাঠশালার ছুটি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ছেলেরা আর কতটুকু গণ্ডগোল করিতে পারে? কলের মধ্যে যেন এককুড়ি পাঠশালায় একত্রে সমস্বরে নামতা পাঠ হইতেছে। হাঁ—কল যে সাহেববাড়ির, তাহাতে সন্দেহ নাই। হরসিত বলিয়াছিল—ছাদ ফেটে যাবে, সেইটাই বুঝি সত্য-সত্য ঘটিয়া বসে!

কিন্তু এত যে গোলযোগ, পাথরখানা বদলাইয়া দিতেই চুপচাপ। ক্রমশ শোনা গেল, চোঙের ভিতর হইতে একলা গলায় গীত হইতেছে—ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা—একবারে স্পষ্ট আর অবিকল মানুষের গলা! মানুষ দেখা যায় না, অথচ মানুষই গাহিতেছে।

মণ্টুর অনেকক্ষণ হইতে মনে হইতেছিল, ঐ চোঙের ভিতর কাহারা বসিয়া বসিয়া বাজাইতেছে—ঠিক তাহার বুড়োদাদা যেমন দুলিয়া দুলিয়া তেহাই দিয়া থাকেন, তেমনি আবার তেহাই দেয়। এবারে গান শুনিয়া তাহার আর এক ফোঁটা সন্দেহ রহিল না।

চোঙের অধিবাসী সেই গায়ক ও বাদক-সম্প্রদায়কে দেখিতে

ছেলের দল ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু কলের ভিতর হরসিত এমনি করিয়া দলসুদ্ধ পুরিয়া ফেলিয়াছে যে কাহাকেও দেখিবার জো নাই।

বুঁচি খুব কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সরিয়া দূরে দাঁড়াইল। শঙ্কা হইল—ঐ কলওয়ালা কত লোককে ত পুরিয়াছে, যদি কাছে পাইয়া তাহাকেও পুরিয়া ফেলে—তখন? কিন্তু টেঁপি বুঁচির চেয়ে দু-বছরের বড়, বুদ্ধিও বেশি, সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিল—বাক্স ত ঐটুকুন মোটে, বড় বড় মানুষ কি করে থাকে?

বাক্সের ও মানুষের আয়তনের তারতম্য হিসাব করিলে মনে ঐ প্রকার সন্দেহের উদয় হইতে পারে বটে, কিন্তু যখন স্পষ্ট মানুষের গলা শোনা যাইতেছে তখন যেমন করিয়া এবং যত ঠাসাঠাসি করিয়াই হউক তাহারা ত আছে নিশ্চয়!

বাড়ুয্যে ঠিক সামনে বসিয়াছেন। গানবাজনার আসরে এই স্থানটি তাঁহার নিত্যকালের। বনকাপাসীতে কত মজলিস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন ওস্তাদ ত একজন আসিল না যে তিনকড়ি বাড়ুয্যের পায়ে ধূলা না লইয়া চলিয়া যাইতে পারিল।

আগাগোড়া সভাসুদ্ধ লোক বিমুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে, কেবল রাম মিত্তির বলিলেন—গলার মোটে দানা নেই, দেখছ বাড়ুয্যে? যতই হোক টিনের চোঙ আর কাঠের বাক্স ত!

কে-একজন নেপথ্যে মন্তব্য করিল—সকাল বেলা এই খরচান্ত, মিত্তির মশায়ের গায়ের জ্বালা কিছুতে মরছে না।

রাম মিত্তিরের সঙ্গে বাঁড়ুয্যের মিতালি সেই নকুল গুরুর কাছে পড়িবার সময় হইতে। কলের গানের জন্য সকলে ধরিয়া পড়িয়া রাম মিত্তিরের একটা টাকা খরচ করাইয়া দিল, সেজন্য মন খারাপ আছে

নিশ্চয়। কিন্তু বাঁড়ুয্যের কেমন মনে হইল, রাম তাঁহাকে খোশামোদ করিয়াই গানের নিন্দা করিতেছে—টাকার শোকে নহে।

প্রিয়নাথ বলিল—ও বাঁড়ুয্যে মশায়, গান-বাজনায় চুল ত পাকালেন, কত গানই গেয়ে থাকেন, এমন সুর লয় শুনেছেন কখনও? নাপতের পো ডাকিনী-সিদ্ধ, অপ্সরী-কিন্নরী ধরে এনে গান গাওয়াচ্ছে যেন।

গানের পর গান চলিল। একটা গানের এক জায়গায় ভারী তানের প্যাঁচ মারিতেছিল। অশ্বিনী শীল অকস্মাৎ উচ্ছ্বাস ভরে বলিয়া উঠিল—কি কল বানায়েছে সাহেব কোম্পানি। দেবতা—দেবতা—ব্রহ্মা-বিষ্ণুর চেয়ে ওরা কম কিসে? বাঁড়ুয্যে মশায়, আপনার সেতারের টুং-টাং আর রামপ্রসাদীগুলো এবার ছাড়ুন।

কলের বলবান রাগিণীর তলায় অশ্বিনীর গলা চাপা পড়িল, বাঁড়ুয্যে তাহার সদুপদেশ শুনিতে পাইলেন না।

কিন্তু বাঁড়ুয্যের আর কি আছে ঐ সেতারের টুং-টাং ছাড়া? চকমিলানো পৈতৃক প্রকাণ্ড বাড়িটা খা-খা করে—চামচিকার বসতি। সেখানে থাকিবার লোক তিনটি—মণ্টু, তার দিদিমা এবং তিনকড়ি বাঁড়ুয্যে স্বয়ং। নারাণীও ছিল—সেই সকলের শেষ। সাত বছর আগে মণ্টুকে ছ'মাসের এতটুকু রাখিয়া সে-ও ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। ছয় ছেলের মা বাঁড়ুয্যে-গিন্নী একে একে সব ক'টিকে বিসর্জ্জন দিয়া এই শেষের ধন মরা-মেয়ের বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন। পাড়ার সকলে আসিয়া আর সান্ত্বনা দিবার কথা খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু বাঁড়ুয্যের চোখে জল নাই। রাম মিত্তির কাঁদ-কাঁদ গলায় কহিলেন—বুক বাঁধ বাঁড়ুয্যে, ভগবানের লীলা। তখন বাঁড়ুয্যে স্ত্রীকে দেখাইয়া বলিলেন—ঐ যে অবুঝ মেয়েমানুষ উঠোনের ধুলোয়

গড়াগড়ি যাচ্ছে, ওকে গিয়ে তোমরা প্রবোধ দাও—আমার কাছে আসতে হবে না ভাই। শুধু তিনি তাকের উপর হইতে সেতারটি নামাইয়া দিতে বলিলেন।...

এতকাল বাদে কি-না অশ্বিনী শীল তাঁহাকে সেতার-বাজনা ছাড়িয়া দিতে বলিল!

এক একটা গান হইয়া গেলে হরসিত কাঁটা বদলাইয়া আগের কাঁটা ফেলিয়া দিতেছিল। তাই কুড়াইতে ছেলেদলে কাড়াকাড়ি। একবার আর একটু হইলে মণ্টু কলের উপর দিয়া পড়িত। হরসিত তাড়া দিয়া উঠিল। বাড়ুজ্যে মণ্টুকে ডাক দিলেন—তুই দাদু, আমার কাছে আয়—এসে ঠাণ্ডা হয়ে বোস ত। নারাণীর সেই ছ'মাসের মণ্টু এখন কত বড় হইয়াছে!

কিন্তু মণ্টু আসিল না, উহার অনেক কাজ। কাঁটা কুড়ান ত আছেই, গানও লাগিতেছে বড় ভাল, তা ছাড়া বাক্সের ভিতর বসিয়া যে গায়ক গাহিতেছে তাহার মূর্তিদর্শন সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইবার কারণ এখনও ঘটে নাই।

যখন ভাল করিয়া বুলি ফুটে নাই, বাড়ুজ্যে তখন হইতেই মণ্টুকে তবলার বোল শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রোজ সন্ধ্যায় রাম মিত্তির প্রভৃতি দু'চারজন বাড়ুজ্যে-বাড়ি গিয়া বসেন। শ্রাবণ মাসে বৃষ্টিবাদলা এক একদিন এমন চাপিয়া পড়ে যে কেহ বাড়ির বাহির হইতে পারে না। না পারুক, তাহাতে এমন কিছু অসুবিধা ঘটে না। সেদিন মণ্টুর সেতার-শিক্ষা আরও বিপুল উদ্যমে চলে। ভারী তাল কাটে, লজ্জা পাইয়া মণ্টু বলে—বুড়োদাদা, আজ আর হবে না, ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু ঘুম পাইলেই

হইল! লাউয়ের খোলের ভিতর হইতে সুর আদায় করা সোজা কর্ম্ম নয়।···

অশ্বিনী শীল বনকাপাসীর সুবিখ্যাত সংকীর্ত্তনের দলে খোল বাজাইয়া থাকে। পুনশ্চ উল্লসিত হইয়া সে বলিয়া উঠিল—আজই বাড়ি গিয়ে খোলের দল ছিঁড়ে খড়মে লাগাব। মরি, মরি—কি কীর্ত্তনটাই গাইল রে! আমাদের গানের পরে আজ ঘেন্না হয়ে গেল।

রাম মিত্তির ক্ষীণ আপত্তি তুলিয়া বলিলেন—মন দিয়ে শুনেছ বাঁড়ুয্যে? অন্তরার দিকটায় তালে গোলমাল করে গেল না?

বলিয়াছিল বটে আমীর খাঁ ওস্তাদ বাঁড়য্যেবাবুর কান ডালকুত্তার মাফিক। খাঁ সাহেব অনেক কায়দা করিয়াও বাঁড়ুয্যের কানকে ফাঁকি দিতে পারে নাই, কারচুপিটুকু ঠিক ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। দিল্লিওয়ালা আমীর খাঁ অবধি ভুল করিতে পারে, কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য্য কাঠের বাক্সের গানে একবিন্দু খুঁত ধরিবার জো নাই। রাম মিত্তির তালের কিছু বোঝেন না, তিনি ভুলের কথা বলিলেন। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বাঁড়ুয্যে কি ভুল ধরিবেন?

বিকালেও আর এক বাড়ি বায়না—কামারপাড়ায়। নন্ট শুনিতে গিয়াছে, বাঁড়ুয্যের মাথাটা কেমন টিপ-টিপ করিতেছিল বলিয়া যাইতে পারেন নাই।··· আধঘুমের মধ্যে বাঁড়ুয্যের মনে হইল, কে যেন আসিয়া কপাল টিপিয়া দিতেছে আর ডাকিতেছে—বাবা! মেজ ছেলে মাণিকের গলা না? দশ বছরেরটি হইয়াছিল। গোলাঘাটার বড় ইস্কুলে পড়িতে যাইত। কিন্তু মাণিক নয়, মাণিক গিয়াছে ঘুড়ি উড়াইতে—নারাণী—নারাণী। নারাণী ডাকিতেছে—বাবা, বাঘ এয়েছে—খোকাকে ধরলে যে! নারাণী মাথা খুঁড়িয়া

মরিতেছে।...ঘরের মধ্যে বাঘ? সেতারের তাল কাটিয়া গেল। মার সেতারের বাড়ি বাঘের মাথায়—মার—মার। মণ্টুকে ছাড়িয়া বাঘ সেতার কামড়াইয়া ধরিল, তার ছিঁড়িল, চিবাইয়া চিবাইয়া আগাগোড়া একেবারে তছনছ। তা যাক, মণ্টু কই?—মণ্টু—মণ্টু! বাড়ুয্যে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন—মণ্টু!

মণ্টু গান শুনিয়া ফিরিয়াছে। তাহার আনন্দ ধরিতেছিল না। বলিল—বুড়োদাদা, তুমি গান শুনলে না—আমরা শুনে এলাম, দুই টাকার গান। এবেলা আরও খাসা খাসা। তুমি অমনি ভাল করে গাও না কেন দাদা?

বাড়ুয্যে কহিলেন—ভাল গাইনে?

মণ্টু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না। তুমি গাও ছাই—বুধোকাকারা বলেছে।

বাড়ুয্যে একটুখানি চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর যেন কত বড় রসিকতার কথা—প্রবলবেগে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—জানিস নে ও মণ্টু, জানিস নে—ও যে কোম্পানিবাহাদুরের কল, ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি পারি? গোটা জেলাটা জুড়ে ওদের রাজ্যি, আর আমি ব্রহ্মোত্তরের খাজনা পাই মোটে একান্ন টাকা সাত আনা—

বলিতে বলিতে সেতারটা পাড়িয়া লইলেন।

মণ্টু বলিল—সেতারে কত ঝঞ্চাট, কলের গান আপনাআপনি বাজে—আমাকে একটা কলের গান এনে দিতে হবে।

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—দেব, বুঝলি দাদু, কলের গান দেব আর সেই সঙ্গে কলের হাত-পা-নাক-চোখওয়ালা একটা নাতবৌ—কি বলিস?

বলিতে বলিতে গলাটা যেন বুজিয়া আসিল, তবু বলিতে লাগিলেন—ওস্তাদের কত গালাগাল খেয়েছি, সরস্বতী ঠাকরুণকে কত চিনির নৈবিদ্যি খাইয়েছি। এখন আর কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। তোরা যখন বড় হবি মণ্টু, ততদিনে সরস্বতী দুর্গা কালী শালগ্রামটা পর্য্যন্ত কলের হয়ে যাবে। খুব কলের পূজো করিস—

সন্ধ্যা গড়াইয়া যায়। আজ বাঁড়ুয্যে-বাড়ি কেহ আসে নাই। মণ্টুও নাই। কেবল রাম মিত্তিরের খড়মের ঠকঠকি সিঁড়িতে শোনা গেল।—কি বাঁড়ুয্যে, একা একা খুব লাগিয়েছ যে—সুরটা পূরবী বুঝি!

বাঁড়ুয্যে তদ্গত হইয়া সেতার বাজাইতেছিলেন। বলিলেন—দোসর কোথায় পাই ভাই? চাঁদা তুলে ঠাকুরবাড়িতে আবার কলের গান দিচ্ছে—মণ্টু গেছে সেখানে। একা-একাই বাজাচ্ছি—কেমন লাগছে বল ত?

রাম মিত্তির বলিলেন—এখন রেখে দাও, এ-সব ত রোজ শুনব। চল ঠাকুরবাড়ি যাওয়া যাক—

বাঁড়ুয্যেকে লইয়া রাম মিত্তির ঠাকুরবাড়ির আসরে বসিলেন। হরসিতের কলে ইতিমধ্যে দু-খানি গান সারা হইয়া একটো শুরু হইয়াছে—

কি করিলি অবোধ বালিকা?
সুধা ভ্রমে হলাহল করিলি যে পান—

চেহারা ত দেখা যায় না, তবে হাঁ—গলা শুনিয়া একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে বক্তা ভীম রাবণ বা অন্তত পক্ষে তস্য পুত্র মেঘনাদ না হইয়া যায় না।

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—তুমি বাপু, একখানা পূরবী বাজাও ত।

হরসিত ঘোরপ্যাচের মানুষ নয়, জবাব সোজা করিয়াই দিল—হুকুম-টুকুম চলবে না মশাই, যা বাজাই শুনে যান—আমার সাহেব-বাড়ির কল—

অতএব সাহেববাড়ির কলের যেরূপ অভিপ্রায় হইল, বনকাপাসীর সমুদয় শ্রোতা তটস্থ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল—ইহা 'আমীর খাঁ 'ওস্তাদের মজলিস নয় যে ফরমায়েস খাটিবে।

অকস্মাৎ—ঘটর্ ঘটর্ ঘাস্—

গান থামিয়া গেল। কলের কোথায় কি কাটিয়া গিয়াছে। এতগুলি শ্রোতা বিরসমুখে বসিয়া রহিল। যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া হরসিত কাঠের বাক্সটা খুলিয়া আলগা করিয়া ফেলিল।

কলের ভিতর মানুষ নাই, কেবল লোহালক্কড়।

হরসিত অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু মেরামত হইল না। তখন থালা হইতে বায়নার টাকা ও পেলার পয়সা তুলিয়া লইয়া উল্টাগাঁটে ভাল করিয়া গুঁজিয়া সে বলিল—রাত্তিরে আর নজর চলে না মশাই। সকালেই ঠিক করে বাকি গানগুলো শুনিয়ে দেব, কিরপা করে মশাইরা সকলে পদধূলি দেবেন।

ঠাকুরবাড়িতে গ্রামস্থ সকল মহাশয়েরই সকালে যথাসময়ে ভিড় হইল, কিন্তু হরসিত নাই, কলের গান নাই, এমন কি নেত্য ঠাকরুণের পিতলের ঘটিটিও নাই। জল খাইবার জন্য হরসিতকে ঘটিটি দেওয়া হইয়াছিল।

অশ্বত্থামার দিদি

*

গুরুপুত্র অশ্বত্থামার গরু-চুরি মোকর্দ্দমায় এক বৎসরের জেল হইয়া গেল।

অধিকারী একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিল। কারণ, তিলসোনার মজুমদারেরা লোক ভাল নয়। বাড়ি আসিয়া পাঁচ টাকা বায়না দিয়া গিয়াছে এবং বারংবার বলিয়া গিয়াছে—কালী-পূজো মঙ্গলবারে, তার পরের দিন বুধবার তেরই তারিখে গান। বেলাবেলি হাজির হোয়ো হে, সাতাশ গ্রাম নেমন্তন্ন—। অতএব গাফিলি হইলে তাহারা সহজে ছাড়িবে না নিশ্চয়। সেই তেরই-ও ত আসিয়া পড়িল।

অধিকারী চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, মা কালীর খাঁড়ার লক্ষ্য এবার তাহারই মাথাটা।

কিন্তু মাথায় হাত দিয়া ত খাঁড়ার কোপ ঠেকান চলে না। কাজেই আর একবার সৃষ্টিধরের হাত পায়ে ধরিয়া দেখা ছাড়া উপায় কি? তিলসোনার আসরে অশ্বত্থামা সাজিয়া যদি সে এবারকার মত ইজ্জত বাঁচাইয়া দেয়!

সৃষ্টিধর বিদ্বান ব্যক্তি, ইংরাজী ফার্স্ট বুকও পড়িয়াছে—কিন্তু তাহার মোটে বিবেচনা নাই। গত বৎসর যাত্রাদলের সূচনার সময় সৃষ্টিধরকে অনেক বলা-কওয়া হইয়াছিল, এমন কি দশ টাকা করিয়া মাহিনা দিবার কথাও উঠিয়াছিল। কিছুতে সে দলে আসিল না, সাফ জবাব দিল—দশটাকায় ষাঁড় কিনে কাজ চালাও গে—

কিন্তু সৃষ্টিধরের গোঁফ উঠে নাই, নধর চেহারা, রাণী সখি বা নিতান্ত পক্ষে রাজপুত্র বেশেই মানায়, তাহাকে ত সেনাপতি সাজিতে ডাকা হয় নাই। অতএব ষাঁড় দিয়া তাহার কাজ চলে কি করিয়া?

যাহা হউক সে-সব আবশ্যক হয় নাই, বলাই তেলিকে পাওয়া গিয়াছিল এবং বড় সুবিধা মতই পাওয়া গিয়াছিল। খুব ফুর্ত্তিবাজ লোক, টাকাকড়ির খাঁই মোটেই নাই। খুলনার দিকে কোথায় তাহার মামার বাড়ি, মামারা বড়লোক। যে মরশুমে দলের গাওনা থাকিত না, মামার বাড়ি ডুব মারিত। ফিরিয়া আসিয়া দিন কতক হরদম খরচ করিত। অশ্বত্থামার পার্টও বলিত খাসা।

কিন্তু তিলসোনার বায়না লইবার কয়েকদিন পরে অকস্মাৎ একদিন থানার দারোগা আসিয়া বলাইকে ধরিয়া লইয়া গেল, উহারা কয়জনে মিলিয়া নাকি কোন্ গ্রাম হইতে গরু সরাইয়া ঝিকরগাছির হাটে বেচিয়া আসিয়াছে। তারপর জেল।

অধিকারী মনে মনে সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছিল—একটা রাতের গাওনা মোটে, টাকা তিনেকের মধ্যেই সৃষ্টিধর রাজি হইয়া যাইবে। তাহারও কিঞ্চিৎ হাতে রাখিয়া প্রথমে সে প্রস্তাব করিল দু'টাকা—

কিন্তু সৃষ্টিধর গরজ বুঝিয়া হাঁকিল একবারে সৃষ্টিছাড়া দর—পাঁচ টাকার কম হবে না।

লোকটার সত্যই বিবেচনা নাই। পঁচিশ টাকা বায়না, জুড়ি বেহালাদার প্রভৃতিকে ধরিয়া মানুষও জন পঁচিশেকের কম হইবে না। তাহার মধ্যে একা অশ্বত্থামাকে যদি পাঁচ টাকা বখরা দিতে হয় তাহা

হইলে তস্য পিতা দ্রোণাচার্য্য পিতামহ ভীষ্ম মধ্যম-পাণ্ডব ভীম প্রভৃতি মহা মহা বীরগণের ভাগে কি পড়িবে ?

তিন, সাড়ে তিন, পৌনে চার করিয়া অবশেষে পুরাপুরি চারই স্বীকার করিতে হইল। না করিয়া উপায় নাই। এই কয়দিনের মধ্যে পাট মুখস্থ করিয়া একরকম চালাইয়া দিতে পারে, এ অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র ঐ স্মৃতিধর।

গীতাভিনয় শুরু হইয়া গিয়াছে।

দ্রোণাচার্য্যের প্রায় আজানুলম্বিত দাড়ি—রাজবাড়িতে মাস্টারি করিবার মানানসই দাড়ি হইয়াছে বটে। আসরের দক্ষিণ কোণে অশ্বত্থামা চি-চিঁ করিয়া বলিতেছে—দুধ, দুধ খাব বাবা—আর দ্রোণাচার্য্য দুই হাতে সেই দাড়ি-সমুদ্র অনবরত আলোড়িত করিয়া একবার ঝাড়-লণ্ঠনের মধ্যে একবার বেহালাদারদের পশ্চাদ্দেশে একবার বা ছেঁড়া সামিয়ানার ফাঁকে আকাশমুখো তাকাইয়া দুধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু এত অত্যুৎকৃষ্ট স্থান হইতেও দুধ মিলিল না। শেষে একজন ছোকরা হারমোনিয়ামের বাক্সের এক কোণ হইতে একটা ছোট এলুমিনিয়মের তেলের বাটি বাহির করিয়া আগাইয়া দিল। দ্রোণাচার্য্য কোন প্রকার উপকরণ ব্যতীত বোধ করি কেবলমাত্র তপঃ-প্রভাবেই সেই বাটিতে পিটালি গুলিয়া দুধ বলিয়া ফাঁকি দিয়া অশ্বত্থামাকে খাওয়াইয়া দিলেন। আর সেই নিরাকার পিটালিগোলার শক্তিই বা কি অসামান্য! মুহূর্ত্ত মধ্যে অশ্বত্থামার মিহি গলা দস্তুরমত সবল হইয়া উঠিল এবং আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত বিশ হাত আসরের আগাগোড়া প্রদক্ষিণ করিয়া দুধ খাওয়ার আনন্দে একটো করিয়া করিয়া সে লাফাইতে লাগিল।

চারিদিকে বাহবা বাহবা পড়িয়া গেল। চিকের আড়ালে একটি বধূ কেবলি চোখ মুছিতেছিল—মজুমদার-স্টেটের রকম সাত আনা শরিক স্বর্গীয় যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ উমাশশী। তার যেন কেমন মনে হইল, ঐ অশ্বত্থামা তাহার ভাই, সে তাহার দিদি।

উমার কাঁচা বয়স, তবু এটুকু বুঝিবার বুদ্ধি আছে যে ইহার কিছু সত্য নহে, অভিনয় মাত্র। কিন্তু সত্য হউক, মিথ্যা হউক, অমন সুন্দর ছেলেটি আসরের পাশে পড়িয়া একটুখানি দুধ খাইবার জন্য অত করিয়া কাঁদিতে লাগিল ত! আর যখন দুধ বলিয়া খানিক পিটালির গোলা খাওয়াইয়া দিল অশ্বত্থামা রাগ করিয়া ঐ বাটিসুদ্ধ আসর ডিঙাইয়া কলাবনের মধ্যে ফেলিয়া দিল না কেন? তাহা না করিয়া অবোধ বালক আনন্দে নাচিতে লাগিল।···

যাত্রা দেখিতেছে আর কত কি ভাবিতেছে এমনি সময়ে উমার মনে পড়িয়া গেল, তাহার খোকামণি এতক্ষণ হয়ত জাগিয়াছে। সন্ধ্যার সময় তাহাকে খাটের উপর ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া মোক্ষদাকে সেখানে বসাইয়া তবে গান শুনিতে আসিয়া বসিয়াছে। সে আদুরে ঝি মোক্ষদা এতক্ষণ কি করিতেছে তার ঠিক কি! হয় ঘুম মারিতেছে, নয় ত এই ভিড়ের মধ্যে কোনখানে চুরি করিয়া বসিয়া সে-ও গান শুনিতেছে। মোটে এক বছরের একরত্তি ছেলে, দুধ খাইবার সময় হইয়াছে, বাড়িতে কেহ নাই, জাগিয়া থাকে ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া খুন হইতেছে। ব্যস্ত হইয়া উমাশশী উঠিয়া পড়িল।

ছয় শরিকের এজমালি কালীপূজা। সম্পত্তির অংশক্রমে যাত্রা-দলের লোকজন খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যদুনাথের তরফে খাইবে বারজন।

অনেক রাতে গান ভাঙিয়া গেলে পুরুষমানুষদের খাওয়া শেষ হইয়া গেল। তারপর উমা খাইতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—যাত্রার লোকেরা খেয়ে গেছে ?

বামুন-ঠাকরুণ উত্তর করিলেন—না বৌমা, এমন কি নবাব-পুত্তুররা এয়েছেন যে সন্ধ্যে না লাগতে বাবুদের আগে-ভাগে খাইয়ে দেব। আমার সব হয়ে গেছে, আর দেরি নেই। মোক্ষদা এবার ডাকতে যাক. মোক্ষদা—ও মোক্ষদা—

উমার খাওয়া শেষ হইয়া আসিয়াছিল। অবশিষ্ট ভাতগুলির কতক খাইয়া তাড়াতাড়ি আঁচাইতে গেল।

মোক্ষদা তখন উপর হইতে নিচে নামিতেছে।

উমা কহিল—কেমন গান শুনলি মোক্ষদা ?

মোক্ষদা বিস্ময়ে খানিকক্ষণ কথাই বলিতে পারিল না, শেষে কহিল—অ পোড়াকপাল, আমি গেনু কখন ? আমি বলে—মাজার ব্যথায় ছটফটিয়ে মরি—

উমা হাসিয়া ফেলিল।—তুই যে সেই আঁধারে আঁধারে কচুবনের পাশ দিয়ে—আমি নিজের চোখে দেখলাম। তা বেশ ত, কি হয়েছে তাতে, তুই খোকাকে একলা ফেলে চলে গেছিস, আমি কি তা কাউকে বলতে যাচ্ছি ?

অতঃপর মোক্ষদার আর মনে না পড়িবার কথা নয়—এখন স্মরণ না হইলে আরও যে কি বাহির হইয়া পড়িবে তার ঠিক কি ?

বলিল—আস্তে কথা কও বৌদি, শুনতে পেলে গিন্নিমা আস্ত রাখবে না। বামুন-ঠাকরুণকে বলে দিইছিনু—যখন যুদ্ধ হবে আমায় ডেক। তিনি এসে বললেন, মোক্ষদা, দেখসে এসে ভীম সাঁই-সাঁই

করে কী গদাই ঘুরুচ্ছে! তাই গিইছি আর এয়েছি—দাঁড়াই নি মোটে—

উমা বলিল—আর অশ্বত্থামা কেমন একটো করলে বল দিকিন! দেখতেও যেন রাজপুত্তুর, না?

মোক্ষদা ঘাড় নাড়িয়া সংক্ষেপে সারিল—হুঁ। তাহার মাথার মধ্যে তখনও সাঁই-সাঁই করিয়া ভীমের গদা ঘুরিতেছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল—কিন্তু দুর্য্যোধন কি পালোয়ান রে বাপু! আমি গুণে দেখনু একটা নয়, দুটো নয়—ভীম ছয় ছয়টা গদার বাড়ি মারলে তবু লাফাতে লাফাতে চলে গেল। সোজা কথা? ভীমের ঐ গদাটা বিশ পঁচিশ মন হবে, না বৌদি?

কিন্তু গদাতত্ত্বের আলোচনা আর অধিক চলিল না, বামুন-ঠাকরুণ ডাকিতেছিলেন—ও মোক্ষদা, ডাকতে গেলি নে? যা দিদি, আমি আর কত রাত অবধি ভাত চৌকি দেব?

উমাও বলিল—যাচ্ছিস ডাকতে? যা—কেন মিছিমিছি রাত করিস? আর ঐ যে অশ্বত্থামা—চিনতে পারবি নে?—যে দুধ দুধ করে কাঁদছিলো গো, তাকেও ডেকে আনবি। বারজন খাবে আমাদের বাড়িতে—ঐ ছেলেটাও খাবে। যদি না আসতে চায়, ছাড়বি নে, বুঝলি?

মোক্ষদা ডাকিতে চলিয়া গেল।

এবারে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া উমা দেখিল আয়োজন প্রচুর। ভীমরুলের ডিমের মত মোটা মোটা আউশচালের ভাত, পুঁইডাটার চচ্চড়ি এবং খেসারির ডাল রান্না হইয়া গিয়াছে, এখন নিবন্ত উনানে পাঁচ-সাতটি বেগুন পোড়াইয়া দিলেই হইয়া যায়। কহিল—ও বামুন-মা, করেছ কি? এই দিয়ে লোকগুলো কিকরে খাবে?

বামুন-ঠাকরুণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—বল কি বৌমা, বেগুন-পোড়া দিয়ে তিন তিনটে তরকারি হল—আরো খাবে কি দিয়ে? বাড়িতে ওরা কি সোনা-স্বর্ণ খেয়ে থাকে? তুমি ছেলেমানুষ, জানো না ত—

কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও উমা জানে। এই সব লোক যাহারা যাত্রার দলে রাজা সাজিয়া বেড়ায় আবার বাড়িতেও ভাঙামণ্ডপে সাবেকি চালে একরকম নিশ্চিন্তভাবে হুঁকা টানিয়া থাকে এবং ধান-ভরা সবুজ বিলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আগামী পৌষে নূতন গোলা বাঁধিবার স্বপ্ন দেখে, তাহারা সদাসর্ব্বদা যে-অপরূপ সোনা-স্বর্ণ খাইয়া থাকে তাহা উমা ভাল করিয়াই জানে।…সেই যে রূপকথার কোন কাঠকুড়ানি ছেলে-মেয়ে বনের মধ্য দিয়া যাইতেছিল, রাজবাড়ির শ্বেতহস্তী শুঁড়ে করিয়া আনিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিল—উমারও হইল তাই।

উমার বাপের বাড়ি উজ্জলপুরে, এখান হইতে পুরা তিনটি ভাঁটির পথ, একেবারে মধুমতীর উপর। পাঁচ বৎসর আগে সেখানে প্রতি রাত্রে দিদি ও ভাইটি মায়ের কোলে জড়াজড়ি করিয়া শুইয়া থাকিত। খোকা ভাইটি—তার নাম হারাণ। এমনি অবোধ যে আর সকলের মত তাহাদেরও বাবা বাঁচিয়াছিল—এরকম অসম্ভব কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিত না, ইহা লইয়া উমার সঙ্গে ঘোরতর তর্ক করিত।

একবার হইয়াছে কি, চৌধুরীবাড়ি অমিয়ার বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে নানান রকম জিনিষ আসিয়াছে। সেদিন হারাণের আর টিকি দেখিবার জো নাই, বেলা দুপুর অবধি আগামী উৎসবের আয়োজন দেখিতেছে। অমিয়ার কাকা ট্রাঙ্ক

খুলিয়া জিনিষপত্র বাহির করিয়া অমিয়ার মাকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন, উবু হইয়া বসিয়া হারাণ একমনে তাহা দেখিতেছিল।

বাড়ি ফিরিয়া হারাণ উমাকে চুপি চুপি কহিল—আজ এক তা পেয়েছি, কাউকে বলিস নে দিদি। ভুলে ওরা রোয়াকের পরে ফেলে চলে গেল, কেউ নেই দেখে তুলে নিলাম। কি বল্ দিকি? কলকেতার মেঠাই—না? বলিয়া চারিদিক তাকাইয়া কোঁচার খুঁট হইতে অতি সন্তর্পণে সেই দুষ্প্রাপ্য কলিকাতার মিঠাই বাহির করিল।

দেখিয়া খানিকক্ষণ ত হাসির চোটে উমা কথা কহিতেই পারিল না—একটা টকটকে রাঙা মোমবাতি! বলিল—ও হারাণ, ওরে বোকা, তুই যেন কী—বাতি চিনিস নে? বাতি—বাতি···জেলে দিলে ঠিক পিদ্দিমের মত আলো হয়—

দিদির অত হাসি দেখিয়া হারাণ অপ্রস্তুত হইয়া প্রথমটা কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু একটু সামলাইয়া লইয়া শেষে পুরাদস্তুর তর্ক করিতে লাগিল, উহা কক্ষণো বাতি নয়—সে বুঝি বাতি চেনে না? চৌধুরীদের মাণিক নন্দ প্রভৃতিকে স্বচক্ষে ঐ বস্ত খাইতে দেখিয়াছে যে!···

উজ্জলপুর গ্রামখানি পরগণে সৈদাবাদের মধ্যে, অতএব তিলসোনা মজুমদার-স্টেটের অন্তর্গত।

যতুনাথ মজুমদার মহাশয় তখন বাচিয়া; একবার কিস্তির মুখে তিনি স্বয়ং আদায়-পত্র তদারক করিতে গিয়াছিলেন। কাছারিবাড়ির সামনে দিয়া কাঁচা রাস্তা সোজা দক্ষিণমুখো একেবারে খেয়াঘাট অবধি চলিয়া গিয়াছে। সকালবেলা মজুমদার মহাশয়ের অনেক কাজ— রোকড় সেহা খতিয়ান প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে হইত। তাহারই মধ্যে একবার রাস্তার দিকে তাকাইয়া চশমার

ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইতেন, পাততাড়ি বগলে একটি ছেলে একেবারে দিদির আঁচলের মধ্যে গা ঢাকিয়া পাঠশালায় যাইতেছে। দিদি আর ভাই হরদম বকিতে বকিতে যাইত, কি যে বকিত উহারাই জানে।···

মজুমদার মহাশয় রোজই দেখিতেন। একদিন তিনি উমাকে ধরিয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যাবেলা ভাইকে লইয়া ফিরিতেছিল, যদুনাথ রাস্তার পাশে পায়চারি করিতেছিলেন, ডাকিলেন—শোন মা লক্ষ্মী—

উমা সসঙ্কোচে কাছে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যদুনাথ কি যে শোনাইবেন ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন—আমার তিলসোনার বাড়িতে যাবে? আমার ঘরদোর আলো হয়ে যাবে—লক্ষ্মী মা, যাবে ত? বলিয়া পরম স্নেহে উমার মুখের উপর যে ক'গাছি চুল উড়িতেছিল তাহা সরাইয়া দিলেন।

উমা কিছু কিছু বুঝিল, কিন্তু হারাণের কাছে যদুনাথের কথাগুলি বড় দুর্ব্বোধ ঠেকিল। পথে যাইতে যাইতে পরম উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, ওদের বাড়ি তোকে যেতে বলে কেন? আবার যদি জিজ্ঞাসা করে তুই বলে দিস—যাব না। যদি না যাস ওদের লেঠেল-পাইক দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে না ত?

পরদিনই যদুনাথ স্বয়ং উমাদের বাড়ি আসিয়া সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, উমার সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রমানাথের বিবাহ দিতে চান। দেনা-পাওনার কোন কথা নাই, স্বয়ং মা-লক্ষ্মী ঘরে গিয়া উঠিতেছেন, টাকা দিয়া আর কি হইবে?

বিবাহ হইয়া গেল।

যে দিন উমারা রওনা হইয়া যাইবে তার আগের দিন সন্ধ্যায় হারাণ বলিল—দিদি তুই রাজরাণী হলি, তা মাথায় মুকুট কই?

উমা বলিল—যাঃ—রাজরাণী না হাতী, কে বলেছে রে?

কিন্তু হারাণ বুঝি কিছু বোঝে না! বলিল—রাণী নয় ত কি? মা বললে, তবেগে সুশীলা মাণিক সবাই বলছিল—আর তুই লুকুচ্ছিস? ও দিদি, তোদের রাজবাড়িতে যেতে দিবি আমাকে? সেপাইরা মারবে না?

উমা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেউ কোথাও নাই ত? শ্বশুরবাড়ির কথা কহিতে বড় লজ্জা করে, কিন্তু অবুঝ ভাইটিকে আবার লজ্জা! বলিল—ইঃ মারলেই হল! আমায় ভাইটিকে মারে কে? তুই আর একটু বড় হলি নে কেন হারাণ, তা হলে কালই সঙ্গে নিয়ে যেতাম। খানিক বড় হয়ে যাস—গেলে তোকে এত বড় রুইমাছের মাথা দিয়ে ভাত বেড়ে দেব, এই এত বড়—যাবি ত?

হারাণ ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল—হাঁা, আর মেঠাই—কলকেতার মেঠাই দিস? দিবি নে দিদি?—

বামুন-ঠাকরুণের চাকরি অল্পদিনের, তিনি উমার বাপের বাড়ির কোন খবর রাখেন না। বলিতেছিলেন—তুমি মা ছেলেমানুষ—ভাব পিরথিমের সব্বাই বুঝি তোমাদের মত খায় দায়। তিন-তিনটে তরকারি রেঁধেছি, তবু বলছ যাত্রার লোকেরা কি দিয়ে খাবে? আর বড়বাবুর ঘরে দেখে এসগে ত সেখানকার ব্যবস্থা; শুধু ফ্যানসা ভাত আন নূন—তেঁতুলটুকুও নয়—

উমা বলিল—তা হোক বামুন-মা, বাড়িতে কত মিঠাই-মোণ্ডা ভিয়েন হল তার কি কিছু নেই? থাকে ত, ওদের একটা একটা যাহোক কিছু দাও। আচ্ছা, তুমি ভাত বাড়, আমি দেখছি—

উপরে আসিয়া ভাঁড়ার খুঁজিয়া দেখিল, কিছুই নাই। অনেক বড় বড় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাঁহারাই শেষ করিয়া

গিয়াছেন। সে কথা বামুন-ঠাকরুণকে গিয়া বলিতে লজ্জা করিতে লাগিল। যা হয় করুন গিয়া তিনি, উমা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

দেখিল, সারাদিন খাটিয়া-খুটিয়া রমানাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মাথার কাছে আলো জ্বালা। শিয়রে এমনি আলো জ্বালিয়া কখনো ঘুমায়? এমন মানুষ, যদি কোন কিছুর খেয়াল থাকে! উমা আলোটা সরাইয়া জোর কমাইয়া দিল। তারপর খোকার চাঁদের মতো মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিল। সে-ও অঘোরে ঘুমাইতেছে। আজ আর জাগে নাই, দুধও খায় নাই। খোকার সেই দুধের বাটি হাতে করিয়া উমা ফের নিচে নামিয়া গেল।

তখনও বামুন-ঠাকরুণ একলা ভাত লইয়া বসিয়া আছেন। বলিলেন—দেখত মা, মোক্ষদার কাণ্ড! এখনও এল না। হতভাগী কোথায় গল্প গিলতে বসেছে—

উমা বলিল—ওর ঐ রকম, কিছু বোঝে না। আচ্ছা—তুমিও ত যাত্রা শুনেছ বামুন-মা, সব চাইতে ভাল একটো করলে কে? অশ্বত্থামা, না?

বামুন-ঠাকরুণ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—ছাই! একটোর কথা যদি বল ভীমের উপরে কেউ নেই। প্রথম মোহড়ায় গোটা দুই লাফ দিয়েছে কি, সামনে যে ছেলেগুলো বসেছিল তারা ছুটে একেবারে নাটমণ্ডপের নিচে। হবে না, কত বড় বীর! মহাভারত পড়নি বৌমা?

উমা কহিল—তা ঠিক। কিন্তু অশ্বত্থামাকে দেখে আমার বড্ড কষ্ট হয়। গরীব বামুনের অবোধ ছেলে, একটুখানি দুধের জন্যে কি কান্নাটাই কাঁদলে! তারপর দুধের বাটিটা আগাইয়া দিয়া বলিল—ঐ অশ্বত্থামা ছোকরা এখানেই খেতে আসবে, তুমি তাকে এই দুধটুকু দিও বামুন-মা—

বিড়ালের বড় উপদ্রব। বামুন-ঠাকরুণ দুধের বাটি তাকের উপর তুলিয়া ঢাকা দিয়া রাখিলেন। উমা চুপ করিয়া রহিল, তারপর উনানের কাছে সরিয়া গিয়া বসিয়া বলিল—এবারে শীত যা পড়বে—এরি মধ্যে কেমন শীত-শীত লাগছে, দেখ না। আর আমার বাপের বাড়ি এদ্দিন ঠিক লেপ গায়ে দিতে হচ্ছে—একেবারে মধুমতীর উপর কি না! হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল—মজার কথা শোন বামুন-মা, আজকে প্রথমে যখন অশ্বত্থামা আসরে এল, আমি ভাবলাম আমার ভাই হারাণ এল বুঝি। অমন পেটুক তুমি ভূ-ভারতে দেখনি কখনো। অশ্বত্থামা যখন দুধ দুধ করে কাঁদছিল, আমার মনে হল হারাণ কাঁদছে।

বামুন-ঠাকরুণ কহিলেন—তোমার ভাই বুঝি ঐ রকম দেখতে—

উমা কহিল—দূর! ওর চেয়ে ঢের ছোট আর ধবধবে ফর্শা—যেন কড়ির পুতুল। সেবারে যখন এখানে আসি, খুব ভোর বেলা—পানসিতে উঠে দেখলাম, হারাণ কখন এসে ঘাটকিনারে বাবলাতলায় দাঁড়িয়ে আছে। পানসিতে ডেকে তার কড়ে আঙুলে একটু কামড় দিয়ে এলাম। আঙুল কামড়ালে নাকি মায়ামমতা ছেড়ে যায়—ও সব ছাই কথা!

বামুন-ঠাকরুণ উমার দিকে চাহিয়া শুনিতেছিলেন। সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি অনেক দিন বাপের বাড়ি যাওনি, না বৌমা?

উমা মুখখানা ম্লান করিয়া কহিল—হ্যাঁ—আজ তিন বচ্ছর। শ্বশুরঠাকুর মারা যাবার পরে আর যেতে পারি নি। হারাণ বলেছিল—দিদি, তোমার বাড়ি গিয়ে কলকাতার মেঠাই খেয়ে আসব—সে-ও এল না।

বামুন-ঠাকরুণ সমবেদনা প্রকাশ করিয়া কহিলেন—আহা! আসে না কেন?

উমা বলিল—আসে কার সঙ্গে? মোটে এগার বছর বয়স। আর ক'টা বছর বাদে বড় হয়ে আসবে ঠিক। এসে সে আমাকে ফি বছর উজ্জ্বলপুরে নিয়ে যাবে। তখন বছর বছর যাব, কাউকে খোশামোদ করছি নে, আর ক'টা বছর যাক না।

এমন সময় ছেলে কাঁদিয়া উঠিল, কান্না ত নয় যেন উপরে ডাকাত পড়িয়াছে। উমার বড় ইচ্ছা করিতেছিল, যাত্রার লোকদের খাওয়া হইয়া গেলে তবে যাইবে, কিন্তু আর দাঁড়ান চলে না। যাইবার সময় বলিয়া গেল—বামুন-মা, ঐ ছোকরাকে মনে করে দুধটুকু দিও—ভুলো না যেন। তোমার যে ভোলা মন—

এমনি বেশ শান্ত—কিন্তু উমার খোকা একবার কান্না যদি আরম্ভ করিয়াছে, অবাক হইয়া যাইতে হয় অতটুকু গলায় ঐ প্রকার আওয়াজ উঠে কি করিয়া?

ইতিমধ্যে রমানাথেরও ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, উমাকে দেখিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—কোথায় ছিলে এতক্ষণ? জ্বালাতন করলে! যাও, তোমার ছেলে নিয়ে যাও—

উমা ছেলে কোলে করিয়া বাহিরে ছাদের উপরে আসিল।

অন্ধকার রাত্রির মাথার উপর লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র জ্বলিতেছে। উমা ছাদের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছেলে শান্ত করিতে লাগিল। ছেলেকে বুকের উপর চাপিয়া বারংবার বলিতেছিল—কাঁদিস নি মাণিক আমার, ধন আমার, আর কাঁদে না। আজকে আর দুধ পাবি নে—তোর সে দুধ দিয়ে দিইছি—একদিন দুধ না খেলে কি হয়? ওরে

হিংসুটে, তবু কাঁদিস? তুই রোজ খাস, ওরা যে জন্মে কোন দিন দুধ খেতে পায় না—। চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিল—আ-মরে যাই, মরে যাই, খোকনমণির কি হয়েছে? ও খোকা, মামার বাড়ি যাবি? মামা দেখবি? তুই ঘুমিয়েছিলি, দেখলি নে খোকা, তোর মামা এসেছিল – কেমন সুন্দর টুকটুকে মামা। দুধ-টুধ যা ছিল সব সে খেয়ে গেছে—এক ফোঁটাও নেই। কান্না কেন ও আমার গোপাল, তুমি এখন ঘুমোও। আয় চাঁদ আয়-আয়—খোকার কপালে চিক দিয়ে যা—

উমা আবার যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল, রমানাথ বিছানায় উঠিয়া বসিয়া আলো ধরিয়া ছারপোকা মারিতেছে। কহিল—নতুন হিম পড়ছে, অমনি করে এখন বাইরে বাইরে ঘোরে?

যেন কে কাহাকে কহিতেছে, উমা যেন ঘরে নাই। ঘুমন্ত ছেলেকে কোল হইতে নামাইয়া সে আস্তে আস্তে শোয়াইয়া দিল।

রমানাথ কাছে আসিয়া উমার একখানি হাত ধরিয়া বলিল—রাগ করেছ উমা? ঘুমের ঘোরে আমি কি বকেছি, আমার কিচ্ছু মনে নেই—

আর উমা চোখের জল ঠেকাইতে পারিল না, বর্ষার মধুমতী উমার চোখের কূলে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। রমানাথের কোলের উপর মাথা রাখিয়া উমা কাঁদিতে লাগিল, আর রমানাথ বিব্রত হইয়া তাহার চোখ মুছাইতে মুছাইতে বলিতে লাগিল—আমায় মাপ কর—মাপ কর উমা, অত কাঁদছ কেন? কি হয়েছে? না, একেবারে পাগল তুমি—

কতক্ষণ পরে কাঁদিতে কাঁদিতে উমা বলিল—আমি উজ্জ্বলপুরে

যাব, কতদিন যাই নি বল ত। আমার বুঝি হারাণকে মাকে দেখতে ইচ্ছা করে না—

রমানাথ বলিল—এই কথা? দাঁড়াও, কিস্তির মুখটা কেটে যাক, তারপর ছয় দাঁড়ের পানসি নিয়ে যাব—তুমি যাবে, আমি যাব, খোকা যাবে, মোক্ষদাও যাবে, আর কেঁদ না লক্ষ্মিটি—

যাত্রাওয়ালাদের ডাকিয়া আনিতে সত্যসত্যই অনেক রাত্রি হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে মোক্ষদার অপরাধ নাই। মোক্ষদা গিয়া দেখিল, অশ্বত্থামা ইতিমধ্যে পোষাক ছাড়িয়া ফেলিয়া বেঞ্চে বসিয়া বিড়ি টানিতেছে, কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি রথিবৃন্দ দাড়ি-গোঁফ-সমন্বিত অবস্থাতেই বায়নার টাকার বখরা করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। অবশেষে অনেক কষ্টে হিসাব মিটিয়া প্রতিজনের ভাগে সাড়ে দশ আনা করিয়া পড়িল। দ্রোণাচার্য্য পয়সা গণিয়া ট্যাঁকে বাঁধিলেন, তারপর ছোঁ মারিয়া অশ্বত্থামার মুখ হইতে বিড়িটি কাড়িয়া লইয়া টানিতে লাগিলেন। অধিকারী অমনি হাঁ-হাঁ করিয়া আসিল, অমন দাড়ি-পরা অবস্থায় বিড়ি খায় কখনো? পাঁচসিকা দামের দাড়িটায় আগুন লাগিলে একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে যে!

বারজনকে একত্র করিয়া গোছাইয়া বাড়ির ভিতর লইয়া যাইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল।

আর সকলের খেসারি ডাল অবধি পৌঁছিয়া ইতি, কেবলমাত্র সৃষ্টিধরের পাতের কোলে দুধের বাটি আসিল। সে যে আজিকার আসরে অত্যুৎকৃষ্ট একটো করিয়া সকলকে বিমোহিত করিয়াছে এবং তজ্জন্য অন্তঃপুরে আহারের এই বিশেষ ব্যবস্থা, তাহাতে সৃষ্টিধরের সন্দেহমাত্র রহিল না।

ফার্স্ট বুক ও চিত্রাঙ্গদা

*

রামোত্তম রায় মহাশয়ের সেজছেলে ননী তিন বছরে তের খানা ফার্স্ট বুক ছিঁড়িল, কিন্তু ঘোড়ার গল্প ছাড়াইতে পারিল না।

ব্যাপারটা আর কোনক্রমে অবহেলা করা চলে না। অতএব পশু মাস্টারের ডাক পড়িল।

পশুপতির নামডাক যেমন বেশি, দরও তেমনি কিছু বেশি। তা হউক। ছেলে আকাটমূর্খ হইয়া থাকে, সে জায়গায় দু-একটা টাকার কম-বেশি এমন কিছু বড় কথা নয়।

সাব্যস্ত হইল, আট টাকা মাহিনা, তা ছাড়া রায় মহাশয়ের বাড়িতেই পশুপতি খাইবে, থাকিবে। পড়াইতে হইবে ফার্স্ট বুক, শিশুশিক্ষা, সরল পাটীগণিত—সকালে একঘণ্টা, সন্ধ্যার পর দু-ঘণ্টা মাত্র।

বাহিরবাড়ির কাছারিঘরের পাশে ছোট্ট সংকীর্ণ ঘরখানিতে চুন ও সুরকি বোঝাই থাকিত, উহা পরিষ্কৃত হইয়া একপাশে পড়িল তক্তাপোশ আর একপাশে একটি টেবিল ও ছোট বেঞ্চি একখানি।

পড়াশুনা বিপুল বেগে আরম্ভ হইল।

লোকে যে বলে, পশু মাস্টার গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করিতে পারে—তাহা মোটেই মিথ্যা নয়। ছয় মাস না যাইতেই ননী শিশুশিক্ষা ছাড়াইয়া বোধোদয় ধরিল, পাটীগণিতের ত্রৈরাশিক শুরু হইয়া গিয়াছে, ফার্স্ট বুকও শেষ হইবার বড় বেশি দেরি নাই।

বনমর্ম্মর

আশ্বিন মাস, দেবীপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি।

অন্যান্য বার মহালয়ার সঙ্গেই ইস্কুল বন্ধ হইয়া যায়। এবার বছর বড় খারাপ, ছেলেরা মাহিনাপত্র মোটে দিতেছে না, তাই দেরি পড়িয়া যাইতেছে।

সকাল হইতে আকাশ মেঘলা। স্নান সম্বন্ধে বারমাসই পশুপতি একটু বেশি সাবধান হইয়া চলে; এমন বাদলার দিনে ত আরোই। খাওয়াদাওয়া সারিয়া ইস্কুলের পথে পা বাড়াইয়াছে এমন সময়ে পিওন একখানা চিঠি দিয়া গেল।

খামের চিঠি হইলে কি হয়, ইস্কুলমাষ্টারের নামে আসিয়াছে—অতএব ভিতরে এমন-কিছু থাকিতে পারে না যাহা না পড়া পর্য্যন্ত প্রাণ আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতে থাকে। এমনই আঁকাবাঁকা অক্ষরে ঠিকানা-লেখা খাম পশুপতির নামে বহুকাল ধরিয়া আসিতেছে। বিবাহের পর প্রথম বছর তিন-চারের কথা ছাড়িয়া দিলে পরবর্ত্তী সকল চিঠির সুর একটি মাত্র। খাম না ছিঁড়িয়া পত্রের মর্ম্ম স্বচ্ছন্দে আগে হইতে বলিয়া দেওয়া যায়, প্রভাসিনী সংসারখরচের টাকা চাহিয়াছে।

ইস্কুলে গিয়া স্থির হইয়া বসিতে না বসিতে ঘণ্টা বাজিল।

প্রথমে অঙ্কের ক্লাস। ক্লাসে ঢুকিয়াই প্রকাণ্ড একটা জটিল ভগ্নাংশ বোর্ডে লিখিয়া পশুপতি হুঙ্কার দিল—খাতা বের কর্—টুকে নে। বলাটা অধিকন্তু, সকল ছেলে ইহা জানে এবং প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তারপর বোর্ডের উপর নক্ষত্রগতিতে অঙ্কের ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইল। পশুপতি কষিয়া যাইতেছে, মুছিতেছে, আবার কষিতেছে। জোর কদমে-চলা ঘোড়ার খুরের মত খটাখট ক্রমাগত খড়ির আওয়াজ, তা ছাড়া সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ। ক্লাসের মধ্যে যেন

কোন ছেলে নাই, কিংবা থাকিলেও হয়ত একেবারে মরিয়া আছে। প্রকাণ্ড খড়ির তাল দেখিতে দেখিতে জ্যামিতিক বিন্দুতে পরিণত হইয়া গেল। ছেলেরা একটা অঙ্কের মাঝামাঝি লিখিতে লিখিতে তাকাইয়া দেখে কোন্ ফাঁকে সেটা শেষ হইয়া আর একটি শুরু হইয়াছে; দ্বিতীয়টি না লিখিতে সেটা মুছিয়া তৃতীয় একটা আরম্ভ হয় এবং সেটা ধরিবার উপক্রম করিতে করিতে পরেরটি শেষ হইয়া যায়। গায়ে তাহার নীল খদ্দরের জামা। ইহাই মধ্যে যখন একটু ফাঁক পায়, পকেট হইতে নস্যের শামুক বাহির করিয়া এক টিপ নাকে গুঁজিয়া দেয়, তারপর নাকের বাহিরের নস্য ঝাড়িয়া হাতখানা জামার উপর ঘসিয়া সাফ করিয়া আরম্ভ করে—শেষ হল? ফের দিচ্ছি আর গোটা-আষ্টেক—

এমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। লোকের মুখে পশু মাস্টারের এত নামডাক শুধু শুধু হয় নাই, সে তিলার্দ্ধ ফাঁকি দেয় না।

চারিটা ক্লাস পড়াইবার পর টিফিনের ঘণ্টা বাজিলে পশুপতি বাহির হইয়া আসিল। তখন নস্য ও খড়ির গুঁড়ায় জামার নীল রঙ ধূসর হইয়া গিয়াছে।

সিঁড়ির নিচে জানালাহীন ঘরখানিতে ক্লাস বসান যায় না। ইনস্পেক্টর মানা করিয়া গিয়াছে, সেখানে বসিলে ছেলেদের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যাইবে। সেইটি মাস্টারদের বসিবার ঘর। ইতিমধ্যেই সকলে আসিয়া জুটিয়াছেন। হুঁকা গোটা পাঁচ সাত—কোনটার গলায় কড়ি-বাঁধা, কোনটায় কেবলমাত্র রাঙা সুতা, একটির নলচের উপর আবার ছুরি দিয়া গর্ত্ত করিয়া লেখা হইয়াছে—'মা' অর্থাৎ মাহিষ্যের হুঁকা। নিজ নিজ জাতি বিবেচনা করিয়া মাস্টারেরা উহার এক একটি তুলিয়া লইলেন। যাঁহাদের ভাগ্যে হুঁকা জোটে নাই,

তাঁহারা অনুকল্পে বিড়ি ধরাইলেন। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ছোট ঘরখানি অন্ধকার। রসালাপ ও প্রচণ্ড হাসি ক্রমশ জমিয়া আসিল। ক্ষণে ক্ষণে আশঙ্কা হয়, বুঝি-বা অত আনন্দের ধাক্কা সহিতে না পারিয়া বহুকালের পুরানো ছাদ ভাঙিয়া-চুরিয়া সকলের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে।

কিন্তু ইস্কুলের জন্মকাল হইতে এমনি আটত্রিশ বছর চলিয়া আসিতেছে, ছাদ ভাঙিয়া পড়ে নাই।

উহারই মধ্যে একটা কোণে বসিয়া পশুপতি খামখানা খুলিল। খুলিতেই আসল চিঠিখানা ছাড়া আর এক টুকরা কাগজ উড়িয়া মেজেয় গিয়া পড়িল। তুলিয়া দেখে—অবাক কাণ্ড! ইহা হইল কি করিয়া?

এই সেদিন মাত্র সে খোকাকে ধরিয়া ধরিয়া অ-আ লেখাইয়া বাড়ি হইতে আসিয়াছে, এরই মধ্যে ছেলে নিজের হাতে পত্র লিখিয়াছে। কাহাকে দিয়া কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ কাটিয়া লইয়াছে, সেই ফাঁকের মধ্যে বড় বড় করিয়া লিখিয়াছে—

> বাবা, আমি পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছি। ছবির বই আনিবে।
> ইতি।—কমল।

একবার, দুইবার, তিনবার সে পড়িল। লেখা যেমনই হউক, অক্ষরের ছাঁদ কিন্তু বেশ। বড় হইলে খোকার হাতের লেখা ভারি সুন্দর হইবে! পশুপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। এই ছেলে আবার বড় হইবে, তাহার দুঃখ ঘুচাইবে, বিশ্বাস ত হয় না! পর পর আরও তিনটি এমনি বয়সে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে।···ভাবিতে ভাবিতে সে কেমন একটু উন্মনা হইয়া পড়িল।

পরক্ষণে খোকার চিঠি খামে পুরিয়া বাহির করিল প্রভাসিনী যেখানি লিখিয়াছে।

ছোট ছোট অক্ষরের সারি চলিয়াছে যেন সারবন্দী পিপীলিকা। বিস্তর দরকারি কথা—সাংসারিক অনটন, ধানচালের বাজার-দর, গোয়ালের ফুটা চাল দিয়া জল পড়িতেছে, তারিণী মুখুয্যে বাস্তুভিটার খাজনার জন্য রোজ একবার তাগাদা করিয়া যায়—ইত্যাদি সমাপ্ত করিয়া শেষকালে আসিয়া ঠেকিয়াছে কয়েকটি অত্যাবশ্যক জিনিষের ফর্দ—ছুটিতে বাড়ি যাইবার মুখে খুলনা হইতে অতি অবশ্য অবশ্য সেগুলি কিনিয়া লইয়া যাইতে হইবে, ভুল না হয়।

পশুপতি ফর্দখানির উপর আর একবার চোখ বুলাইল, তারপর পকেট হইতে পেন্সিল লইয়া পাশে পাশে দাম ধরিতে লাগিল।

কি ভাগ্য যে এতক্ষণ এদিকে কাহারও নজর পড়ে নাই। এইবার রসিক পণ্ডিত দেখিতে পাইল এবং ইসারা করিয়া সকলকে কাণ্ডটা দেখাইল। তারপর হঠাৎ ভারী ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল—পশুভায়া, করেছ কি? হাটের মধ্যে প্রেমপত্তোর বের করতে হয়? ঢাকো—শিগগির ঢাকো, সব দেখে নিল—

পশুপতি আপনার মনে ছিল, তাড়াতাড়ি চিঠি চাপা দিয়া মুখ তুলিল।

হাসি চাপিয়া অত্যন্ত ভালমানুষের মত রসিক কহিল—ঐ নকুড়চন্দোর বাবুর কাণ্ড, আড়চোখে দেখছিলেন।

নকুড়চন্দ্র বসিয়াছিলেন ঘরের বিপরীত কোণে। বুড়ামানুষ, কাহারও স্ত্রীর চিঠি চুরি করিয়া দেখিবার বয়স তাঁহার নাই। পশুপতি বুঝিল, ইহাদের সুদৃষ্টি যখন পড়িয়াছে এখানে বসিয়া আর কিছু হইবে না। উঠিয়া পড়িল।

মন্মথ গরাই অত্যন্ত সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল—মিছে কথা পশুপতিবাবু, কেউ দেখছে না। আপনি বসুন, বসুন। পণ্ডিত মশায়ের অন্যায়, ভদ্রলোকের পাঠে বাধা দিলেন। আপনি এই আমার পাশে এসে বসুন ;···গিন্নী কি পাঠ দিয়েছেন সেইটে একবার পড়ে শোনাতে হবে কিন্তু—

পশুপতি কোনোদিন এই সব রসিকতায় যোগ দেয় না। আজ তাহার কি হইয়াছে, বলিল—এই কথা? তা শুনুন না—বলিয়া চিঠির উপর দৃষ্টি দিয়া মিছামিছি বলিতে লাগিল—প্রাণবল্লভ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়রঞ্জন,—আর সব ও-পাতায় আছে, হল ত! পথ ছাড়ুন মন্মথবাবু—বলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

রসিক কহিতে লাগিল—দেখলে? তোমরা তর্ক করতে, পশুপতি হাসতে জানে না—দেখলে ত? অন্যদিন বাড়ির চিঠি পেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে, আজ যেন নবযৌবন পেয়েছে। ওহে মন্মথ, আজকের চিঠিতে কি আছে একবার দেখতে পার চুরি-চামারি করে?

ঘরের বাহির হইয়াই কিন্তু পশুপতির হাসি নিবিয়া গিয়া ভাবনা ধরিল—পাঁচ টাকা দু-আনার মধ্যে প্রভাসিনীর শাড়ি, খোকার জামা, জিরামরিচ, পানে খাইবার চুন দু-সের, এক কৌটা বার্লি, বালতি এবং ছবির বই—এতগুলি কি করিয়া কুলাইয়া উঠে?

তখন ছেলের দল হাসিয়া খেলিয়া চেঁচাইয়া লাফাইয়া ইস্কুলের উঠানটি মাত করিয়া ফেলিয়াছে। পশু মাস্টারকে দেখিয়া সকলে সন্ত্রস্তভাবে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। কিন্তু পশুপতির কোন দিকে নজর নাই, সে ভাবিতেছে—

ইস্কুলে পঁচিশ টাকা বলিয়া তাহাকে সহি করিতে হয়, কিন্তু আসল মাহিনা পনর টাকা। চিঠিতে ঐ যে তারিণী মুখুয্যের তাগাদার কথা লিখিয়াছে, এবার বাড়ি গেলে মুখুয্যের খাজনা অন্তত টাকা তিন-চার না দিলে রক্ষা নাই। আবার অগ্রহায়ণে নূতন ধান-চাল উঠিবে, চাষীদের সহিত ঠিকঠাক করিয়া এখনই অগ্রিম কিছু দিয়া আসিতে হইবে, না হইলে পরে দেখিয়া শুনিয়া কে কিনিয়া দিবে? অতএব ইস্কুলের মাহিনার এক পয়সা খরচ করিলে হইবে না। ভরসা কেবল রামোত্তমের বাড়ির আটটি টাকা। তাহা হইতে বাড়ি যাইবার রেল-স্টিমারের ভাড়া দুই টাকা চৌদ্দ আনা বাদ দিলে দাঁড়ায় পাঁচ টাকা দু-আনা। সমস্ত পূজার বাজার ঐ পাঁচ টাকা দু-আনার মধ্যে।

হেডমাস্টার কোন দিক দিয়া হঠাৎ কাছে আসিয়া ফিশ-ফিশ করিয়া কহিলেন—সেক্রেটারির অর্ডার এসেছে, বন্ধ শনিবারে। ছেলেদের এখন কিছু বলবেন না, খালি ভয় দেখাবেন—কালকের মধ্যে যদি মাইনে সব শোধ না করে তবে একদম ছুটি হবে না। মাইনে-পত্তোর আদায় যদি না হয়, বুঝতে পারছেন ত?

ছুটির পর পশুপতি ও বুড়া নকুড়চন্দ্র পাকা-রাস্তার পথ ধরিল। নকুড় কহিলেন—বন্ধ তা হলে শনিবারে ঠিক? শনিবারেই রওনা হচ্ছ পশুবাবু?

সে কথার জবাব না দিয়া পশুপতি জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা নকুড়বাবু, ছবির বই একখানার দাম কত?

—কি বই তা বল আগে। ছবির বই কি এক রকম? দু-টাকার তিন টাকার আছে, আবার বিনি পয়সাতেও হয়।

পশুপতি কাছে আসিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—বিনি পয়সায় কি রকম? বিনি পয়সায় ছবির বই দেয় নাকি? কি বই?

নকুড় কহিলেন ক্যাটালগ। ছেলে-ভুলানো ব্যাপার ত? একখানা কবিরাজি ক্যাটালগ নিয়ে যেও। এই ধর, হাঁপানী-সংহারক তৈল—পাশে দিব্যি ছবি, একটা লোক ধুঁকছে—কোলের উপর বালিশ—বউ তেল মালিশ করছে। ছেলেকে দেখিয়ে দিও।

যুক্তি পশুপতির পছন্দ হইল না, হাসি পাইল। কমলকে দেখেন নাই ত! সে যে বানান করিয়া করিয়া পড়িতে শিখিয়াছে, তাহার কাছে চালাকি চলিবে না। কহিল—না, তাতে কাজ নেই—একখানা ছবির বই, সত্যি-সত্যি ছবির বইয়ের দাম কত পড়বে? দু-টাকা তিন টাকা ও-সব বড়মানুষি কথা ছেড়ে দিন, খুব কমের মধ্যে—যার কমে আর হয় না, কত লাগবে?

নকুড় কহিলেন—বোধ হয় গণ্ডা চারেক পয়সা নেবে, কিনি নি কখনও। মাস্টারির পয়সা—মুখে রক্ত-ওঠানো পয়সা। ও রকম বাজে খরচ করলে চলে?

পশুপতি তখন ফর্দ্দ বাহির করিয়া আর একবার পড়িতে পড়িতে জিজ্ঞাসা করিল—আর, পাথুরে চুন দু-সের?

নকুড় কহিলেন—তিন আনা।

এবারে নকুড়ের হাতে কমলের চিঠিটুকু দিল। কহিল—মজাটা দেখুন মশাই, ছেলে আবার চিঠি লিখেছে—ফরমায়েসটা দেখুন পড়ে একবার। বলিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর বড় ফর্দ্দখানি দেখাইয়া বলিল—বড় সমস্যায় পড়েছি, একটা সৎযুক্তি দিন

ত নকুড়বাবু। পুঁজি মোটে পাঁচ টাকা দু-আনা—ফর্দ্দের কোন কোনটা বাদ দি?

দেখি—বলিয়া নকুড় চশমা বাহির করিয়া নাকের উপর পরিলেন। তারপর বিশেষ প্রণিধান করিয়া বলিলেন—ছেলেপিলের ঘর, দুধ মেলে না বোধ হয়—তাই বার্লির কথা লিখেছে; ওটা নিয়ে যেও। তা জিরেমরিচ চুন-টুন সব বাদ দাও। ছবির বই পয়সা দিয়ে কিনে কি হবে? যা বললাম, পার ত একখানা ক্যাটালগ নিয়ে যেও। তোমরা বোঝ না—ছেলেপিলে যখন আবদার করে মোটে আস্কারা দিতে নেই। তাদের শিখিয়ে দিতে হয়, এক আধলাও যাতে বাজে খরচ না করে। গোড়া থেকে মিতব্যয়িতা শিখুক, তবে ত মানুষ হবে—

মনে কেমন কেমন লাগে বটে, কিন্তু মোটের উপর নকুড়ের কথাটা ঠিক। পশুপতির স্মরণ হইল, সে-ও ক্লাসের একখানি বাংলা বহিতে সেদিন পড়াইতেছিল—'অপব্যয় না করিলে অভাব হয় না। হে শিশুগণ, তোমরা মিতব্যয়ী হইতে অভ্যাস করিবে। তাহা হইলে জীবনে কদাপি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না…' এমনি অনেক ভাল ভাল কথা। ছবির বই জিরামরিচ ও চুন কিনিয়া কাজ নাই তবে, বালতি বার্লি ও কাপড়-জামা কিনিয়া লইলেই চলিবে।

নকুড় কহিতে লাগিলেন—তিল কুড়িয়ে তাল! হিসেব করে দেখ ত ভায়া, ছেলেবেলা থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা কত পয়সা অপব্যয় করেছি। সেইগুলো যদি জমানো থাকত তবে আজ দুঃখ কিসের? বাঙালী জাত দুঃখ পায় কি সাধে?

পশুপতি আর কথা না কহিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

গ্রামের মধ্যে কয়েক বাড়ি দেবীর ঘটস্থাপনা হইয়াছে। বড়

মধুর সানাই বাজিতেছে। পশুপতির কানে নূতন লাগিল, এমন বাজনা সে অনেক দিন শোনে নাই। হঠাৎ সে হাসিয়া উঠিল, বলিল—কথা যা বললেন নকুড়বাবু, ঠিক কথা! আমরা কি হিসেব করে চলি? আমাকে আজ দেখছেন এই রকম—শখ করে আমিই একবার একখানা বই কিনি—সে-ও একরকম ছবির বই, ইস্কুল কলেজে পড়ায় না। দাম পাঁচ টাকা পুরো।

নকুড় শিহরিয়া উঠিলেন—পাঁচ টাকার বাজে বই, বল কি?

—হুঁ, পাঁচ টাকা। তখন কি আমার এই দশা? বাবা বেঁচে! পায়ে পম্প-শু, মাথায় টেড়ি। কলকাতায় বোর্ডিংয়ে থেকে পড়তাম। মাসে মাসে টাকা আসে। ফুর্ত্তি কত! বইখানার নাম চিত্রাঙ্গদা—সেই যে অর্জ্জুন আর চিত্রাঙ্গদা—পড়েন নি?

নকুড় কহিলেন—পড়িনি আবার, কতবার পড়েছি। বল যে মহাভারত। আজকাল সেই মহাভারত বিকুচ্ছে এগার সিকেয়।

পশুপতি কহিল—মহাভারত নয়, তাহলেও বুঝতাম বই পড়ে পরকালের কিছু কাজ হবে। এমনি একখানা পদ্যের বই, পাতায় পাতায় ছবি। রাতদিনই তাই পড়ে পড়ে মুখস্থ করতাম। এখন একটা লাইনও মনে নাই।

পশুপতির নির্ব্বুদ্ধিতার গল্প শুনিয়া নকুড় আর কথা বলিতে পারিলেন না। মহাভারত রামায়ণ নয়, মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুরের অনুমোদিত ইস্কুল বা কলেজ-পাঠ্য বই নয়, এমন বই লোকে পাঁচ টাকা দিয়া কিনিয়া পড়ে!

সেই-সব দিনের অবিবেচনার কথা ভাবিয়া পশুপতিরও অনুতাপ হইতেছিল। বলিল—তা-ও কি বইটা আছে? জানা নেই, শোনা নেই—পরস্য পর একটা মেয়ে—নির্ব্বিচারে দামি বইটা তার হাতে

তুলে দিলাম। কি বোকাই যে ছিলাম তখন! ও—আপনি ত এসে পড়েছেন একেবারে—আচ্ছা—

নকুড় বামদিকের বাঁশতলার সরুপথে নামিয়া পড়িলেন। সামনেই তাঁহার বাড়ি। কহিলেন—কাল আবার দেখা হবে। শিগগির শিগগির চলে যাও পশুবাবু, চারদিকে থমথমা থেয়ে আছে, বিষ্টি নামবে এক্ষুণি।

তখন সত্যসত্যই চারিদিক নিষ্কম্প, বাতাস আদৌ নাই, গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। মাথার উপরে অতি-ব্যস্ত আকাশ মেঘের উপর মেঘ সাজাইয়া নিঃশব্দে আয়োজন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

আজ পাঁচ টাকার মধ্যে সমস্ত পূজার বাজার সারিতে হইতেছে, আর বহু বৎসর পূর্ব্বে একদিন ঐ দামের একখানি নূতন বই নিতান্ত শখ করিয়া বিসর্জ্জন দিয়াছিল, একবিন্দু ক্ষোভ হয় নাই—চলিতে চলিতে কতকাল পরে পশুপতির সেই কথা মনে হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সে বাড়ি ফিরিতেছিল, অন্তরভরা আশা ও উল্লাস, হাতে চিত্রাঙ্গদা।

বনগাঁর পর দু-তিনটা স্টেশন ছাড়াইয়া—সে স্টেশনে ট্রেন থামিবার কথা নয়—তবু থামিল। ইঞ্জিনের কোথায় কি কল বিগড়াইয়া গিয়াছে। যাত্রীরা অনেকে নামিয়া পড়িল।

প্লাটফরমের উপরে দক্ষিণ দিকটায় জোড়া পাকুড়গাছ ছায়া করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার গোড়ায় স্টেশনের মরিচা-ধরা ওজনের কলটি। পাকুড়গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়া দিব্য পা ছড়াইয়া কলটির উপর বসিয়া পশুপতি চিত্রাঙ্গদা খুলিয়া পড়িতে বসিল। লাইনের ওপারে অনেক দূরে সূর্য্য অস্ত যায়-যায়। কুয়ায় কলসি ভরিয়া

আল-পথে গ্রামে ফিরিতে ফিরিতে বৌ-ঝিরা তাকাইয়া তাকাইয়া রেলগাড়ি দেখিতেছিল।

পশুপতি একমনে পড়িয়া চলিয়াছে। ঠিক মনে নাই, বোধ করি অর্জ্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার প্রথম পরিচয়ের মুখটা—খাসা জমিয়া উঠিয়াছে। এমন সময়ে সে অনুভব করিল, জোড়াগাছের পিছনে কেহ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখানে চিত্রাঙ্গদার আসিবার ত সম্ভাবনা নাই। পশুপতি ভাবিল, হয় পানিপাঁড়ে কি পয়েণ্টসম্যান, নয় ত ছাগলে গাছের পাতা খাইতে আসিয়াছে। অতএব না ফিরিয়া পাতা উল্টাইতে যাইতেছে, এমন সময়ে কাঁচের চুড়ি বাজিয়া উঠিল।

তাকাইয়া দেখে, বছর আষ্টেকের একটি মেয়ে, মুখখানার চারিপাশে কালো কালো চুলগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে।

পশুপতি স্পষ্ট দেখিতে পাইল, মেয়েটির বড় বড় চোখ দুটির উপর লেখা রহিয়াছে, সে ঐ পাতার ছবিগুলি ভাল করিয়া দেখিবে। আপিস-ঘরে টেলিগ্রাফের কল টক-টক করিয়া বাজিয়া যাইতেছিল এবং লাইনের উপরে ইঞ্জিন একটানা শব্দ করিতেছিল—ইস্-স্-স্। আজ পশুপতি ভাবিতেছে, সে-সব নিছক পাগলামি—সেদিন কিন্তু সত্যসত্যই তাহার মনের মধ্যে এরূপ একটা ভাবাবেশ জমিয়া আসিয়াছিল, যেন সুবিপুল ব্রহ্মাণ্ডও তাহার গতিবেগ থামাইয়া ম্লান অপরাহ্ণ-আলোয় মেয়েটি লুব্ধ ভীরু চোখ দুটিকে সমীহ করিয়া প্লাট-ফরমের ধারে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিল—খুকী, ছবি দেখবে? দেখ না কেমন খাসা খাসা সব ছবি।

অনুরোধের অপেক্ষামাত্র। তৎক্ষণাৎ মেয়েটি সেই মরিচা-ধরা ওজন-যন্ত্রের উপর বিনাদ্বিধায় পশুপতির পাশে বসিয়া পড়িল।

ফার্ষ্ট বুক ও চিত্রাঙ্গদা

পশুপতি ছবির মানে বলিয়া দিতেছিল, সে নিজেও পশুপতির পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা না রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে বানান করিয়া পড়িতেছিল। এমন সময় ঘণ্টা দিল। ইঞ্জিন ঠিক হইয়াছে—এইবার ছাড়িবে। পশুপতির মনে হইল, অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করিয়া ইঞ্জিন ঠিক হইয়া গেল। মেয়েটির মুখখানিও হঠাৎ কেমন হইয়া গেল—তাহার ছবি দেখা তখনও শেষ হয় নাই, সে কথা মোটে না ভাবিয়া রেলগাড়ি তার সুদীর্ঘ জঠরে ছবির বই সমেত মানুষটিকে লইয়া এখনি গুড়গুড় করিয়া বিলের মধ্য দিয়া দৌড়াইবে—বোধকরি এইরূপ ভাবনায়। বইখানি মুড়িয়া নিজেই সে পশুপতির হাতে দিল, কোন কথা বলিল না।

পশুপতি সেই সময়ে করিয়া বসিল প্রকাণ্ড বে-হিসাবি কাজ। সেই চিত্রাঙ্গদা তাহার ডুরে শাড়ীর উপর রাখিয়া বলিল—এ বই তুমি রেখে দাও—ছবি দেখো, আর বড় হলে পড়ে দেখো—। নূতন বই—প্রায় আনকোরা, পাঁচ পাঁচটা টাকা দিয়া কিনিয়াছিল। কেবল নিজের নামটি ছাড়া কালির আঁচড় পড়ে নাই। কাহাকে দিল তাহার পরিচয়ও জানে না—হয়ত কোন রেলবাবুর মেয়ে কিংবা যাত্রীদের কেহ অথবা নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিনীও হইতে পারে।

*　　　*　　　*

রামোত্তম রায়ের বাড়ি বড়রাস্তার ঠিক পাশেই। রোয়াকে উঠিয়া পশুপতি ডাকিল—ও ননী, এক গ্লাস জল দিয়ে যা ত বাবা।

ননী জল দিয়া গেল। তাকের উপরে কাগজের ঠোঙায় এক

পয়সার করিয়া বাতাসা কেনা থাকে। তাহার দুইখানি গালের মধ্যে ফেলিয়া ঢকঢক করিয়া সমস্ত জল খাইয়া পরম পরিতৃপ্তিতে কহিল—আঃ—

ইহাই নিত্যকার বৈকালিক জলযোগ।

তারপর এক ছিলিম তামাক খাইয়া চোখ বুজিয়া সে অনেকক্ষণ বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিল; সঙ্গে সঙ্গে বাতাস। রোয়াকের গোড়া হইতে একেবারে বড়রাস্তা অবধি উঠানের উপর দুই সারি সুপারিগাছ। গাছগুলি যেন মাথা ভাঙা-ভাঙি করিয়া মরিতেছে। জল গড়াইয়া উঠান ভাসাইয়া কলকল শব্দে রাস্তার নর্দ্দমায় গিয়া পড়িতে লাগিল। কি মনে করিয়া পশুপতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জামার পকেট হইতে কমলের পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

ক্রমে চারিদিক আরও আঁধার করিয়া আসিল, আর নজর চলে না।

রাস্তার ঠিক ওপার হইতে ধানভরা সবুজ সুবিস্তীর্ণ বিলের আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পরপারে অতি অস্পষ্ট খেজুর ও নারিকেল-বন। সেইদিকে চাহিয়া পশুপতির মনটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। ঐ নারিকেলগাছের ছায়ায় গ্রামের মধ্যে চাষীদের ঘরবাড়ি। বৃষ্টি ও অন্ধকারে বাড়ি দেখা যাইতেছে না, অতি ক্ষীণ এক একটা আলো কেবল নজরে পড়ে। গ্রামটি ছাড়াইলে তারপর হয়ত আবার বিল। এমনি কত গ্রাম, কত খালবিল, কত বারোবেঁকি, কাচিপাতা ও নাম-না-জানা বড় বড় গাঙ পার হইয়া শেষকালে আসিবে তাহার গ্রামের পাশের পশর নদী। ভাঁটা সারিয়া গেলে আজকাল চরের

উপর বাঁধের ধারে ধারে শরতের মেঘভাঙা রৌদ্রে সেখানে বড় বড় কুমীর শুইয়া থাকে। বাবলাগাছে হলদে-পাখী ডাকে। কমল মিহি সুরে অবিকল পাখীর ডাকের নকল করিতে পারে—বউ সরষে কোট্, বউ—এমন দুষ্ট হইয়াছে কমলটা!

তাহাদের গ্রামের ঘাটে স্টিমার আসিয়া লাগে সন্ধ্যার পর। ঘাটের কাছেই বাড়ি, অন্ধকার সাবেককালের আম-বাগান এবং নাটা ও বেতের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়া সরু পথ। তাহারই ফাঁকে ফাঁকে জোনাকি পোকার মত একটি অতিশয় ছোট আলো দূরে—বহুদূরে—পশুপতির স্তিমিত দৃষ্টির অগ্রে ঐ যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—আলো ছোট হইলে কি হয়, পশুপতি স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। আচ্ছা, তাহাদের গ্রামেও কি এই রকম ঝড়-বৃষ্টি হইতেছে? এই রকম অন্ধকার আকাশ, মেঘের ডাক···? হয়ত এসব কিছুই নয়। হয়ত সে-দেশে এখন আকাশভরা তারা এবং প্রভাসিনী এতক্ষণ রান্নার জোগাড় করিতে আলো লইয়া এ-ঘর-ওঘর করিতেছে। আর চারদিন পরে পশুপতি সেই অপূর্ব্ব শীতল ছায়াচ্ছন্ন উঠানে গিয়া দাঁড়াইবে। খোকা?—সোনামাণিক খোকন তখন কি করিতেছে? পড়িতেছে বোধ হয়—

পশুপতি ভাবিতে লাগিল, সে যেন পশর নদীর পারে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া উঠিয়াছে: কমল শোবার ঘরে প্রদীপের আলোয় পড়া মুখস্থ করিতেছিল, বাপের সাড়া পাইয়া উঠানের উপর দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিল। এমন ছুটিতেছে বুঝি-বা পড়িয়া যায়। আস্তে আয়, ওরে পাগলা একটু দেখে শুনে—অন্ধকারে হোঁচট্ খাবি, অত দৌড়ুস নি—

ঘনান্ধকার দুর্য্যোগের মধ্যে বহুদূর হইতে কমল আসিয়া যেন দুই

হাত উঁচু করিয়া ন্যুব্জদেহ অকালবৃদ্ধ ইস্কুল-মাস্টারের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।...

রামোত্তম এতক্ষণ কাছারি-ঘরে কি কাজকর্ম্ম করিতেছিলেন। এইবার বাড়ির মধ্যে চলিলেন। পশুপতিকে বলিলেন—মাস্টার মশায়, আপনিও চলুন—বাদলা-রাত্তিরে সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড় ন আর কি। এই বৃষ্টিতে আপনার ছাত্তোর আর আসবে না।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পশুপতি সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। আলো নিবাইয়া দিল।

শুইয়া শুইয়া শুনিতে লাগিল, ঝড় দালানের দেওয়ালে যেন উন্মত্ত ঐরাবতের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে, রুদ্ধ দরজা-জানালা খড়খড় করিয়া ঝাঁকাইতেছে, আকাশ চিরিয়া মেঘের ডাক, ছাদের নল হইতে ছড়-ছড় করিয়া জল পড়ার শব্দ···সমস্ত মিলিয়া ঝটিকাক্ষুব্ধ নিশীথিনীর একটানা অস্পষ্ট চাপা আর্ত্তনাদের মত শোনাইতেছে।

পশুপতি আরাম করিয়া কাঁথা টানিয়া গায়ে দিল।

সেই অবিরল বাতাস ও বৃষ্টিধ্বনির মধ্যে পশুপতি শুনিতে লাগিল, গুনগুন গুনগুন করিয়া কমল পড়া মুখস্থ করিতেছে। কণ্ঠ কখনও উচ্চে উঠিতেছে, কখনও ক্ষীণ—ক্ষীণতর—অস্ফুটতম হইয়া সুরের রেশটুকু মাত্র কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেছে। তন্দ্রা-ঘোরে আঁধার আমবাগানের মধ্য দিয়া বাড়িমুখো যাইতে যাইতে সে শুনিতে লাগিল। মনে হইল, ঘরের দাওয়ায় কাঁখের পুঁটুলি নামাইয়া সে যেন ডাকিতেছে—কই গো কোথায় সব?

খোকা আসিয়া সর্ব্বাগ্রে পুঁটুলি লইয়া খুলিয়া ফেলিল।

জিনিষপত্র একটা একটা করিয়া সরাইয়া রাখিতেছে, কি খুঁজিতেছে পশুপতি তাহা জানে। ম্লানমুখে কমল প্রশ্ন করিল—বাবা, আমার ছবির বই ?

পশুপতি উত্তর দিল—সোনামাণিক আমার, বই ত আনতে পারি নি। অপব্যয় করতে নেই—বুঝলি খোকা, পয়সাকড়ি খুব বুঝেসুজে খরচ করতে হয়। তাহলে পরে আর দুঃখ পাবি নে।

ছেলে ঠোঁট ফুলাইয়া সরিয়া বসিল। অবোধ বালকের অভিমানাহত মুখখানির স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কতক্ষণ পরে পশু মাস্টার ঘুমাইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ জাগিয়া ধড়মড় করিয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। প্রাণপণ বলে বারংবার কে যেন দ্বারে ধাক্কা দিতেছে। ঝড়ের বেগ আরও বাড়িয়াছে বুঝি! এ কী প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড, দরজা সত্য-সত্যই চুরমার করিয়া ফেলিবে না কি ?

অন্ধকার ঘর। পশুপতির বোধ হইল, বাহির হইতে কে যেন ডাকিয়া ডাকিয়া খুন হইতেছে—দুয়োর খুলুন—দুয়োর খুলুন—

তখনও ঘুমের ঘোর কাটে নাই। তাহার সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। ঝটিক-মথিত দুর্য্যোগ আঁধার বর্ষা-নিশীথ। নির্জ্জন সুখসুপ্ত গ্রামের একপাশে, দিগন্তবিসারী বিলের প্রান্তে রামোত্তম রায়ের বাহির-বাড়ির রোয়াকে দাঁড়াইয়া কে অমন আর্ত্তকণ্ঠে বারংবার দরজা খুলিয়া দিতে বলে!

শিকলের ঝনঝনানি অতিশয় বাড়িয়া উঠিল। নিশ্চয় মানুষ। পশুপতি উঠিয়া খিল খুলিয়া দিতেই কবাট দুইখানি দড়াম করিয়া

দেওয়ালে লাগিল এবং ঝড়ের বেগেই যেন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল একটি পুরুষ, পিছনে এক নারী।

মেয়েটির হাতের চুড়ি ঝিন-ঝিন করিয়া ঈষৎ বাজিয়া উঠিল এবং কাপড়-চোপড় হইতে অতি কোমল মৃদু সুগন্ধ আসিয়া পশুপতি মাস্টারের ঘর ভরিয়া গেল।

পুরুষ লোকটি আগাইয়া আসিতে গিয়া তক্তপোষে ধা খাইল। পশুপতি কহিল—দাঁড়ান, আলো জ্বালি।

হেরিকেন জ্বালিয়া দেখে, স্বাস্থ্য ও যৌবন-লাবণ্যে দু-জনেই ঝলমল করিতেছে। মেয়েটি ঘরের মধ্যে আসে নাই, চৌকাঠের ওধারে ছাদের নলের নিচে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পরম শান্ত ভাবে ভিজিতেছিল, মুখভরা হাসি। দেখিয়া যুবক ব্যস্ত হইয়া কহিল—অ্যাঁ, ও কি হচ্ছে লীলা, একি পাগলামি তোমার? ইচ্ছে করে ভিজছ দুপুর রাত্রে?

সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া বধূ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

যুবক আরও চটিয়া কহিল—বড্ড স্ফূর্ত্তি—না? এই সেদিন অসুখ থেকে উঠলে, আমি যত মানা করি তুমি মজা পেয়ে যাও যেন।

আঙুল তুলিয়া লীলা চুপি-চুপি তর্জ্জন করিয়া কহিল—চুপ! তারপর ভিতরে ঢুকিল। ফিশ-ফিশ করিয়া কহিল—বাবারে বাবা, তোমার শাসনের জ্বালায় যাই কোথায়? সেই ত কাপড় ছাড়তে হবে, তা একটুখানি নেয়ে নিলাম—বলিয়া আঁচল তুলিয়া মুখে দিল, বোধকরি তাহার হাসি পশুপতি দেখিতে না পায় সেইজন্য।

যাক গে—আর একটা কথাও বলব না, মরে গেলেও না—

বলিয়া যুবক গুম হইয়া রহিল। পরক্ষণে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া ডাকিল—তুই কতক্ষণ ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করে ভিজবি, এখানে এনে রাখ্।

উহাদের চাকর এতক্ষণ বাক্স মাথায় করিয়া রোয়াকের কোণে দাঁড়াইয়া ছিল, ঘরের মধ্যে আসিয়া বাক্স নামাইয়া দিল।

যুবক কহিল—যদি ইচ্ছে হয় তবে দয়া করে বাক্সটা খুলে শিগগির ভিজে কাপড়চোপড়গুলো বদলান হোক, আর ইচ্ছে যদি না হয় তবে এক্ষুণি ফিরে মোটরে যাওয়া যাক। আমি আর কাউকে কিছু বলছি নে।

মেয়েটির হাসিমুখ আঁধার হইল, হেঁট হইয়া বাক্স খুলিতে লাগিল।

কাণ্ড দেখিয়া পশুপতি একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ এতরাত্রে এই তরুণ-দম্পতি কোথা হইতে আসিল এবং আসিয়া নিঃসঙ্কোচে পশুপতির ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই অমনি রাগারাগি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এতক্ষণ ইহাদের মধ্যে কথা বলিবার ফাঁকই পাইতেছিল না, এইবার বলিল—আপনারা তবে কাপড় ছাড়ুন আমি লোকটাকে নিয়ে কাছারি-ঘরে বসিগে

যুবক যেন এইমাত্র পশুপতিকে দেখিতে পাইল। কহিল—কাপড়টা ছেড়ে আমিও যাচ্ছি। বড্ড কষ্ট দিলাম আপনাকে।... আমি এ বাড়িতে আরও অনেকবার এসেছি, রামোত্তম বাবু আমরা পিসেমশাই হন। আপনাকে এর আগে দেখি নে। একটু আলাপ-টালাপ করব—তা মশায়, কাণ্ডটা দেখলেন ত ? সেদিন অসুখ থেকে উঠেছে, কচি খুকী নয়—একটু যদি বুদ্ধি-জ্ঞান থাকে! একেবরে আস্ত পাগল।

লীলা মুখ রাঙা করিয়া একবার স্বামীর দিকে তাকাইল। তারপর রাগ করিয়া খুব জোরে জোরে ট্রাঙ্ক হইতে কাপড়-চোপড় নামাইয়া ছড়াইয়া মেজেয় রাখিতে লাগিল। কাপড়ের সঙ্গে আতরের শিশি ঠক করিয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল।

পশুপতি ও চাকরটি ততক্ষণ কাছারি-ঘরে গিয়া বসিয়াছে।

যুবক কহিল গেছে ত? তক্ষুনি জানি। আস্ত শিশিটা—এক ফোঁটাও খরচ হয়নি।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে লীলা কহিল— আর বোকো না; তোমার আতর আমি কিনে দেব—কালই। তারপর কথা যেন কান্নায় ভিজিয়া আসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল—অজানা জায়গায় এসে লোকজনের সামনে কেবলি বকাবকি—কেন? কিসের এত? আমি বিষ্টি লাগাব, খুব করব, অসুখ করে যাই মরে যাব—তোমার কি?

পাশাপাশি দু'টি ঘর। কলহের প্রতিকথাটি পশুপতির কানে যাইতেছিল।

স্বামী উত্তর করিল—আমার আর কি—আমি ত কারও কেউ নই। ঘাট হয়েছে—আর কোনদিন কিছু বলব না।

কিছুক্ষণ আর কথাবার্ত্তা নাই। খুটখাট আওয়াজ, বাক্সের ভিতরের জিনিষপত্র নাড়াচাড়া হইতেছে।

লীলা বলিতে লাগিল—মোটরের হুড উড়িয়ে যে ভিজিয়ে দিয়ে গেল তাতে কিছু দোষ হয় না, আর আমি একটুখানি বাইরে দাঁড়ায়েছি অমনি কত কথা—আস্ত পাগল—হেনো-তেনো—কেন, কি জন্যে বলবে?

অন্য পক্ষের সাড়া নাই।

পুনরায় বধূর কণ্ঠস্বর—ভিজতে আমার বড্ড ভাল লাগে। ছেলেবেলা এই নিয়ে মা'র কাছে কত বকুনি খেয়েছি। তা বকবে যদি তুমি আমায় আড়ালে বকলে না কেন? অজানা অচেনা কোথাকার কে-একজন তার সামনে···ওগো, তুমি কথা বলবে না আমার সঙ্গে?

স্বামী বলিল—না, বলব না ত। কেউ মরলে আমার কিছু আসে যায় না যখন—বেশ ত—আমি যখন পর—

বধূ কহিল—কতদিন ত সাবধান হয়ে আছি। ছড়ছড় করে জল পড়ছে দেখে আজকে হঠাৎ কেমন ইচ্ছে হল। আমি আর করব না—কোনদিনও না। ওগো, তুমি আমায় মাপ কর—সত্যি করব না।

স্বামীর কণ্ঠ অভিমানে কাঁপিতে লাগিল, বলিল—কথায় কথায় তুমি মরতে চাও—কেন? কি জন্য? আমি কি করেছি তোমার?

বধূ কহিল—না, মরব না।

—দিব্যি কর গা ছুঁয়ে যে কক্ষণো না—কোন দিনও না—

স্বামীকে খুশি করিতে বধূ দিব্য করিল, সে কোনদিন মরিবে না।

আরও খানিকক্ষণ পরে যুবক কাছারি-ঘরে ঢুকিল। পশুপতি কহিল—হয়ে গেছে? এবার চলুন বাড়ির মধ্যে, আমি আলো দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

যুবক কহিল—আজ্ঞে না। এক্ষুণি চলে যাব। সকালে পিসেমশাইকে বলবেন, জাগুলগাছির সুরেশ এসেছিল। থাকলাম না বলে চটে যাবেন—

পশুপতি কহিল—তবে আর কি। আত্মীয়ের বাড়ি এসে পড়েছেন যখন দয়া করে —

সুরেশ বলিল- দয়া করে নয় মশায়, দায়ে পড়ে। ফাল্গুন মাসে ওর টাইফয়েড হয়, একত্রিশ দিন যমে-মানুষে টানাটানি করে কোন গতিকে প্রাণটুকু নিয়ে চেঞ্জে পালিয়েছিলাম। সেই গেছলাম আর আজ এই ফিরছি। স্টেশনে নেমে বিষ্টি-বাদলা দেখে বললাম—কাজ নেই লীলা, রাতটুকু ওয়েটিং-রুমে কাটান যাক। তা একেবারে নাছোড়বান্দা—বলে, মোটরে হুড দেওয়া রয়েছে---এক ফোঁটা জল গায়ে লাগবে না, ঝড়-বাতাসের মধ্যে ছুটতে খুব আমোদ লাগে। শুনেছেন কখনও মশায়, ভূ-ভারতে এমন ধারা? এদেশের ট্যাক্সি—ফাঁকা মাঠের মধ্যে এসে বাতাসে হুড গেল উল্টে। ভিজে একেবারে জবজবে। এখানে উঠতে কি চায়? ভিজে কাপড় বদলাতে একরকম জেদ করে নিয়ে এলাম।

পশুপতি কহিল—বেশ ত, ওঁদের সঙ্গে দেখা-টেখা করে অন্তত রাতটুকু কাটিয়ে কাল সকালেই চলে যাবেন।

সুরেশ বলিল—বলছেন কাকে? ওদিকে একেবারে তৈরি। এরই মধ্যে দু দু-বার দরজার উপর ঠকঠক হয়ে গেছে—শোনেন নি? বিষ্টি বোধ হয় ধরে গেল এইবার। আচ্ছা নমস্কার খুব বিব্রত করে গেলাম—

তরুণ-তরুণী পাশাপাশি গুঞ্জন করিতে করিতে এবং তাহাদের পিছনে চাকরটি ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করিয়া রাস্তার উপরের মোটরে গিয়া উঠিল।

তারপরে সেই রাত্রে অনেকক্ষণ অবধি পশুপতি মাস্টার আর

ঘুমাইতে পারিল না। ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, তারা উঠিয়াছে, আকাশ পরিষ্কার রমণীয়। শিশি ভাঙিয়া ঘরময় আতর ছড়াইয়া গিয়াছিল, তাহার উগ্র মধুর মাদক সুবাসে পশুপতির মাথার মধ্যে রিমঝিম করিয়া বাজনা বাজিতে লাগিল। এই ঘর তৈয়ারি হইবার পর বরাবর চুনসুরকিই পড়িয়া ছিল, এই প্রথম আতর পড়িয়াছে এবং বোধকরি দুর্য্যোগের রাত্রে বিপন্ন তরুণ-দম্পতি কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়া আতরের সহিত তাহাদের কলহের গুঞ্জন রাখিয়া গিয়াছে।

হেরিকেনটা তুলিয়া লইয়া পশুপতি প্রভাসিনীর চিঠিখানি গভীর মনোযোগের সহিত আর একবার পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে সমস্ত অন্তর করুণায় ভরিয়া উঠিল। একটা সোহাগের কথা নাই, অথচ সমস্ত চিঠি ভরিয়া সংসারের প্রতি ও তাহাদের সন্তানের প্রতি কতখানি মমতা ছড়ান রহিয়াছে! কোনদিন সে এসব ভাবিয়া দেখে নাই।

জানালা খুলিয়া দিয়া অনেকক্ষণ একাগ্রে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভাবিতে ভাবিতে পশুপতির মন চলিয়া গেল আবার সেই বহুদূরবর্ত্তী পশর নদীর পারে তাহার নিজের বাড়িতে···এবং সেখান হইতে চলিয়া গেল আরও দূরে, প্রায় বিশ বছরের ওপারে বিস্মৃতির দেশে—যেদিন প্রভাসিনীকে বিবাহ করিয়া গ্রামে ঢুকিয়া সর্ব্বপ্রথমে ঠাকরুণতলায় জোড়ে প্রণাম করিয়াছিল...তারপর কত নির্জ্জন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের মধুর স্মৃতি—ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যাকালে চুরি করিয়া চোখোচোখি—সুপ্তিমগ্ন জ্যোৎস্নারাত্রি জাগিয়া জাগিয়া কাটানো—ভোর হইলে বউকে তুলিয়া দিয়া নিজে আবার পাশ ফিরিয়া শোওয়া···

এখন আর সে-সব কথা কিছু মনে পড়ে না, পৃথিবীতে কিন্তু তেমনি দুপুর সন্ধ্যা ও রাত্রি আসিয়া থাকে; পৃথিবীর লোকে গান গায়, কবিতা পড়ে, প্রেয়সীর কানে ভালবাসার কথা গুঞ্জন করে, আকাশে নক্ষত্র অচঞ্চল দীপ্তিতে ফুটিয়া থাকে, তারার আলোকে নারিকেলপাতা ঝিলমিল করিয়া দোলে। পশুপতি সে-সময় সংসারের অনটনের কথা ভাবে, জ্যামিতির আঁক কষে, নয় ত ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে জানালা আঁটিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

অকস্মাৎ তাহার বোধ হইল, চিত্রাঙ্গদার ভুলিয়া-যাওয়া লাইনগুলি তাহার যেন মনে পড়িতেছে। ছেলেমানুষের মত মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া সে গুন-গুন করিতে লাগিল। এখনও ঠিক মনে পড়ে নাই···মনে হইল, এমনি করিয়া রাত্রি জাগিয়া আরো বহুক্ষণ অবধি যদি সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারে, সমস্ত কবিতাগুলি তাহার মনে পড়িয়া যাইবে।

তারপরে হঠাৎ একটি অদ্ভুত রকমের বিশ্বাস তাহার মনে চাপিয়া বসিল। বহুকাল আগে একদিন স্টেশনে যে-মেয়েটির হাতে সচিত্র চিত্রাঙ্গদা তুলিয়া দিয়াছিল, সে-ই আজ আসিয়াছিল—এই বধূটি...লীলা, এই যেন সেই মুখ। ইহা যে কত অসম্ভব, সেই মেয়ে বাঁচিয়া থাকিলে এতদিনে নিশ্চিত তার যৌবন পার হইয়া গিয়াছে, এসব কথা পশুপতি একবারও ভাবিতে পারিল না। বারম্বার তাহার মনে হইতে লাগিল, ট্রাঙ্কে এই বধূটির কাপড়-চোপড় ছিল, সকলের নিচে ছিল সেই চিত্রাঙ্গদা—পাঁচ টাকা দামের। লীলা আতরের শিশি ভাঙিয়াছে, কে জানে হয় ত চিত্রাঙ্গদাও এই ঘরের মেজেয় ফেলিয়া গিয়াছে। খুঁজিয়া দেখিলে এখনই পাওয়া যাইবে—কিংবা থাকগে এখন খোঁজাখুঁজি, কাল সকালে...

ফার্ষ্ট বুক ও চিত্রাঙ্গদা

পরদিন পশুপতির ঘুম ভাঙিতে বেলা হইয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখে ইতিমধ্যে ননী আসিয়াছে। বেঞ্চের উপর বসিয়া চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া সে ফার্স্ট বুকের পড়া তৈয়ারি করিতেছে—

> One night when the wind was high a small bird flew into my room...
>
> একদিন রাত্রিবেলা যখন বাতাস প্রবল হইয়াছিল, একটি ছোট পাখী আমার ঘরের মধ্যে উড়িয়া আসিয়াছিল...

শুনিতে শুনিতে পশুপতি আবার চোখ বুজিল। ঘরের মধ্যে উড়িয়া-আসা ছোট্ট একটি পাখীর কল্পনা করিতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল, রোদ উঠিয়া গিয়াছে, পাখীর ভাবনা ভাবিবার সময় আর নাই। এখনই হয় ত রামোত্তম ছেলের পড়ার তদারক করিতে আসিবেন। উঠিয়া বসিয়া হুঙ্কার দিল—বানান করে করে পড়্—

রাত্রির রোমান্স

*

বধূ ডাকিল—ঘুমুচ্ছ ?

মনোময় পাশ ফিরিয়া শুইল এবং বলিল—উঁহু—

বধূ কহিল—বালিশ কোথায় ? অন্ধকারে দেখিতে পাচ্ছি না ত! হ্যাঁগো, আমার বালিশ কোথায় লুকিয়ে রাখলে ? না—এই যে পেয়েছি। বলিয়া আন্দাজি বালিশ খুঁজিয়া লইয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িল।

মনোময় বলিয়া উঠিল—আঃ, ঘাড়ের উপর শুলে কেন ? সরে গিয়ে জায়গায় শোও—

বধূ বলিল—সর্ব্বনাশ! গায়ের উপর শুয়েছি নাকি ? পিদ্দিমটা নিভে গেল, অন্ধকারে কিছু বুঝতে পারি নি। ভাগ্যিস কথা কইলে—

কিন্তু কথা যদি মোটে না-ই কহিত তা হইলেও মনোময়ের অস্থিসার দেহটাকে তুলার বালিশ বলিয়া ভুল করা কাহারও উচিত নয়।

এবারে শুইয়া পড়িয়া বধূ চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু কতক্ষণ ! একা-একাই কথা চলিতে লাগিল—ওঃ কী গরম! বৃষ্টি বাদলার নাম-গন্ধ নেই, গরমে সিদ্ধ করে মারছে। তার উপর দু-দুটো উনুনে যেন রাবণের চিতে! সেই বেলা থাকতে রান্নাঘরে ঢুকেছি আর এখন বেরিয়ে আসা। ঘরে একটা জানালাও নেই।…ওগো

ও কর্ত্তা,—ও ছোটবাবু, তোমরা রান্নাঘরে একটা জানালা করে দাও না কেন? এইবার করে দিও—বুঝলে?

তবু ছোটবাবু সাড়া দিল না। বোধকরি সে জানালা করিয়া দিবেই, তাই কথা কহিল না।

বধূর মুখের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কয়টা মশা ভন-ভন করিয়া উঠিল। তবু যা হোক কথার দোসর জুটিল, ঐ মানুষটিকে আর ডাকিয়া ডাকিয়া খুন হইবার দরকার নাই। মশার সঙ্গেই আলাপন শুরু হইল।—দাঁড়া, কাল তোদের জব্দ করছি। সন্ধ্যাবেলা নারকেলের খোসার আগুন করে আচ্ছা করে ধুনো দেব, দেখি ঘরে থাকিস কি করে? খানিক জোরে জোরে পাখা করিতে লাগিল। তারপর মনোময়ের গায়ে নাড়া দিয়া বলিল—ঘুমুচ্ছ কি করে? মশায় কামড়ায় না? সরে এস একটু, মশারি ফেলি—

এখানে বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে ঘুম সম্বন্ধে মনোময়ের বিশেষপ্রকার নিপুণতা আছে। মশা ক্ষুদ্র প্রাণী, কামড়াইয়া কি করিবে? ঘুম যদি সত্যসত্যই আসিয়া থাকে, সুন্দরবনের বাঘে কামড়াইলেও ভাঙিবে না।

বধূ মশারি ফেলিল। মনোময়ের পাশটা গুঁজিয়া দিবার জন্য গায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। খাটের একেবারে কিনার ঘেসিয়া শুইয়াছে মনোময়। বধূ তাহার হাতখানা সরাইয়া দিল, যেখানে সরাইয়া রাখিল, সেইখানেই এলাইয়া রহিল। পুনরায় তুলিয়া লইয়া সেই হাতখানা নিজের হাতের উপর রাখিল। তারপর মনোময়ের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—ঘুমুলে নাকি? ওগো শুনছ? এরি মধ্যে ঘুম!

রাত্রির রোমান্স

মনোময় নড়িয়া চড়িয়া পাশবালিশটা টানিয়া লইয়া বলিল—ঘুম কোথায় দেখলে? বল কি বলবে।

বধূ বলিব—এস খানিক গল্প করি, এত সকাল-সকাল ঘুমোয় না—

মনোময় কহিল—কর।

—কালকে আমি গল্প বলেছি, আজ তোমার পালা। সেই রকম কথা ছিল না?

—হুঁ—

—তবে?

মনোময় বলিল—তা হোক, আজও তুমি বল উষা। কালকের শেষটা শোনা হয় নি—ঘুম এসেছিল।

বধূর নাম উষা। বলিল—আজও তেমনি ঘুমুবে ত?

মনোময় কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল—কক্ষনো না।

উষা কহিল—কিন্তু এখনি ত ঘুমুতে আরম্ভ করেছ, ঐ যে দেখছি—

মনোময় বলিল—দেখতে পাচ্ছ? অন্ধকারে তোমার চোখ জ্বলে বুঝি—

উষা বলিল—জ্বলেই ত। সাত রাজার ধন মাণিকের গল্প শোন নি—অজগর সাপ সেই মাণিক মাথা থেকে নামিয়ে গোবরে লুকিয়ে রাখল, গোবর ফুঁড়েও তার আলো বেরোয়। তেমনি এক-জোড়া মাণিক হচ্ছে আমার এই চোখ দুটো। চিনলে না ত!

মনোময় বলিল—কিন্তু মাণিক ছাড়াও মেনি-বেরালের চোখ অন্ধকারে জ্বলে, বিজ্ঞানপাঠ পড়ে দেখো—

—কিন্তু এবার ত আর চোখ দিয়ে দেখা নয় মশায়, হাত দিয়ে ছোঁওয়া। অন্ধকারের মধ্যে ঊষা মনোময়ের চোখের উপর হাত বুলাইয়া দেখিল, উহা যথানিয়মে মুদ্রিত হইয়া আছে। ভারী রাগিয়া গেল।

—বেশ, ঘুমোও—খুব করে ঘুমোও—আমি জ্বালাতন করব না। বলিয়া সরিয়া গিয়া উল্টাদিকে মুখ করিয়া শুইল।

মনোময়ও সরিয়া অসিল, আসিয়া তাহার একখানা হাত ধরিল। বলিল—ফিরে শোও, অত রাগ করে না—এদিকে একবার ফিরেই দেখ, ঘুমিয়েছি কি-না! ফিরবে না? আহা, যদি কথা না বল মাথা নাড়তে কি বাধা?

অপর পক্ষ নির্ব্বিকার। যেন ঘুম পাইয়াছে, তেমনি গভীর নিঃশ্বাস পড়িতেছে।

মনোময় বলিল—ঘুমুলে নাকি? ও ঊষা, ঘুমিয়ে পড়েছ? তারও পরীক্ষা আছে, সত্যিসত্যি যদি ঘুমিয়ে থাক 'হ্যাঁ'—বলে জবাব দাও।

এবার ঊষা কথা কহিল।—খুব যা তা বুঝিয়ে যাচ্ছ!

মনোময় হাসিতে হাসিতে বলিল—কি?

—এই যে বল্লে, ঘুম এসে থাকলে আমি 'হ্যাঁ'—বলে উত্তর দেব। ঘুম এলে বুঝি জ্ঞান থাকে! ভাব, আমি বুঝিনে কিছু—আমি বোকা!

মনোময়ের দুর্গ্রহ। বলিয়া বসিল—বোকা নও ত কি! আমি বরাবর জেগেই আছি। তুমি চোখে হাত দিয়ে বললে, আমার চোখ বোজা—খোলা চোখে হাত দিলে বুজে যায় না কার? নিজের

চোখে হাত দিয়ে দেখ না। আর, এই নিয়ে তুমি মিছামিছি রাগারাগি করলে—

ঊষাকে বোকা বলিলে ক্ষেপিয়া যায়। বলিল—আমি বোকা আছি, বেশ আছি—তোমার কি? বলিয়া জানালার ধারে একেবারে খাটের শেষপ্রান্তে চলিয়া গেল এবং তাহার ও মনোময়ের মধ্যেকার ফাঁকটুকুতে দুম-দুম করিয়া দুইটা পাশবালিশ ফেলিয়া দিল।

মনোময় হতাশভাবে বলিল—তা বেশ! মাঝে একেবারে ডবল পাঁচিল তুলে দিলে! খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—বেশ, আমার দোষ নেই—এবার তবে নিশ্চিন্তে ঘুমান যাক।

যা বলিল তাই। হাই তুলিয়া সত্য-সত্যই পাশ ফিরিয়া শুইল।

তা হোক! ঊষাও পড়িয়া থাকিতে জানে। দুইজনেই চুপচাপ। যদি কেহ দেখিতে পাইত, ঠিক ভাবিত উহারা নিঃসাড়ে ঘুমাইতেছে।

খানিকপরে ঊষা উসখুস করিতে লাগিল। এমনও হইতে পারে, মনোময় সুযোগ পাইয়া এই ফাঁকে সত্য-সত্যই খানিকটা ঘুমাইয়া লইতেছে। ইহার পরীক্ষা করিতে কিন্তু বেশি বেগ পাইতে হয় না, গায়ে একটু সুড়সড়ি দিলেই বোঝা যায়। ঘুম যদি ছলনা হয় মনোময় ঠিক লাফাইয়া উঠিবে. চুপ করিয়া সে কখনও সুড়সুড়ি হজম করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি সে না ঘুমাইয়া জাগিয়াই থাকে, এবং ঊষা গায়ে হাত দিবামাত্রই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠে! না—রাগ করিয়া শেষকালে অতখানি অপদস্থ হওয়া উচিত হইবে না।

ও-ঘরে বড়জায়ের ছেলে জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে

তিনি দালানে আসিয়া ডাকিলেন—ছোট বউ, অ ছোট বউ, ঘুমুলি নাকি ?

বার দুই ডাকাডাকির পর ঊষা উঠিয়া গিয়া ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল—কি ?

—তোর ঘরে স্পিরিটের বোতলটা আছে, বের করে দে—খোকার দুধ গরম করব।

বোতল বাহির করিয়া দিয়া তোষকের তলা হইতে দেশলাই লইয়া ঊষা প্রদীপ জ্বালিল। মধ্যেকার পাশবালিশের প্রাচীর তেমনি অটল হইয়া আছে। ঊষা যখন উঠিয়া গিয়াছিল, অন্তত সেই অবকাশে বালিশ দুইটির অন্তর্দ্ধান হওয়া উচিত ছিল। কাণ্ডখানা কি ?

দীপ ধরিয়া মনোময়ের মুখের দিকে তাকাইতেই বুঝিতে পারিল, সে দিব্য অঘোরে ঘুমাইতেছে—ঘুম যে অকৃত্রিম, তাহাতে সন্দেহ নাই। দাম্পত্য জীবনের উপর ঊষার ধিক্কার জন্মিয়া গেল। পুরুষমানুষের কেবল চিঠিতে চিঠিতেই ভালবাসা। ভালবাসা, না—ছাই ! গরমের ছুটিতে ক'দিনের জন্য বাড়ি আসা হইয়াছে, একেবারে রাজ্যের ঘুম সঙ্গে করিয়া লইয়া। আজ যখন কাজকর্ম্ম মিটাইয়া নিজেরা খাইয়া বাসনকোশন ও পিঁড়ি তুলিয়া এঘরে চলিয়া আসিতেছে—এমন সময় টুপ-টুপ করিয়া রান্নাঘরের পিছনে সিঁদুরে গাছের তলায় ক'টা আম পড়িল। সেজ-জা প্রস্তাব করিলেন—চলনা ছোট বউ, আম ক'টা কুড়িয়ে আনি। ঊষা বলিল—এখন থাকগে, সকালে কুড়ালেই হবে। সেজ-জা বলিলেন—সকালে কি আর থাকবে ? রাত থাকতেই পাড়ার মেয়েগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। তখন বড়-জা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—না

রাত্রির রোমান্স

—না সেজবউ, ও ঘরে যাক। আর একজনের ওদিকে ঘুম হচ্ছে না, তা বোঝ? চল, তুমি আর আমি কুড়োইগে। আজ তোরও খুব ঘুম ধরেছে, না রে উষা? উষার লজ্জা করিতে লাগিল। জোর করিয়া বলিল—না, আমিও কুড়োতে যাব—এবং খুব উৎসাহের সহিত আম কুড়াইয়া বেড়াইয়াছিল। তখনই কিন্তু ছ্যাঁৎ করিয়া মনে উঠিয়াছিল—জাগিয়া আছে ত?...

এবারে মনোময়ের ট্রাঙ্ক হইতে উষা ক'খানা উপন্যাস আবিষ্কার করিয়াছে। আজ রান্নাঘরে ভাত চড়াইয়া দিয়া তাহার একখানা লইয়া বসিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধন পালিত মহাশয়ের রচিত 'অদৃষ্টের পরিহাস'। বইখানা শেষ করিতে পারে নাই, ফেন উতলাইয়া উঠিল—অমনি সে পাতা মুড়িয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এখন এমন করিয়া একা শুইয়া কি করা যায়, ঘুম যে আসে না! কুলুঙ্গি হইতে বইখানা টানিয়া লইল।...খাসা লিখিয়াছে, পড়িতে পড়িতে উষা অবিলম্বে মগ্ন হইয়া গেল।

উপন্যাসের নায়িকার নাম অধীরা। সম্প্রতি তাহার সঙ্গীন অবস্থা। নায়ক প্রণয়কুমারকে দস্যু ভৈরব-সর্দ্দার ইতিপূর্ব্বে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। অধীরা অনেক কৌশলে তাহার সন্ধান পাইয়া স্বয়ং দস্যুগৃহে গিয়াছিল, এখন রাত্রিবেলা ফিরিয়া আসিতেছে। বর্ণনাটা এই প্রকার—

> একে অমাবস্যার রাত্রি, তায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সূচীভেদ্য অন্ধকার, কেবল মধ্যে মধ্যে খদ্যোতকুল ঈষৎ জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে। এই অন্ধকার-মগ্ন নিস্তব্ধ নিশীথে অরণ্যসমাকীর্ণ পথপ্রান্তে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে কে? পাঠকপাঠিকাগণ নিশ্চয়ই চিনিতে পারিয়াছেন,

ইনি আমাদের সেই জমিদার-দুহিতা ষোড়শী সুন্দরী অধীরা। কণ্টকে পদযুগল রক্তাক্ত হইতেছে, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন সময়ে পশ্চাতে পদধ্বনি শ্রুত হইল। নিশ্চয়ই ভৈরব সর্দ্দারের অনুচর অনুসরণ করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া অধীরা আরও দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। পশ্চাতের পদধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। অধীরা অধিকতর বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুর্দ্দৈব বশতঃ একটি বৃক্ষকাণ্ডে বাধিয়া পদস্খলন হইল। অনুসরণকারী তৎক্ষণাৎ বজ্রমুষ্টিতে তাহার হস্তধারণ করিল। অধীরা নানাপ্রকার অঙ্গসঞ্চালন করিয়া দস্যুহস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা পাইতে লাগিল। এই সময়ে চকিতে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল। দামিনীর তীব্র আলোকে দেখিতে পাইল অনুসরণকারী আর কেহ নহে, স্বয়ং প্রণয়কুমার। প্রণয়কুমার প্রশ্ন করিল—পাপীয়সী, এই গভীর রাত্রে নিবিড় অরণ্য মধ্যে কোথায় চলিয়াছিস? আমি তোকে ভালবাসিয়া পরম বিশ্বাসে বক্ষে ধারণ করিয়াছি, সেই বিশ্বাসের এই প্রতিদান?—প্রণয়কুমার আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ মেঘগর্জ্জন দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তাহার কণ্ঠস্বর বিলুপ্ত করিয়া দিল এবং প্রবলবেগে বাত্যা ও ধারাবর্ষণ আরম্ভ হইল।

ঐ যে বাত্যা ও ধারাবর্ষণ শুরু হইল, ইহার পর পাতা তিনেক ধরিয়া আর তাহার বিরাম নাই। বর্ণনাগুলি বাদ দিয়া ঊষা পর পরিচ্ছেদে আসিল। সেখানেও বৃহৎ ব্যাপার। প্রণয়কুমার একাকী পঞ্চাশজন আততায়ীকে কিরূপ বিক্রম-সহকারে ধরাশায়ী করিয়া দস্যুগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার রোমাঞ্চকর বিবরণ। কিন্তু

ঊষার তাহাতে মন বসিল না। ষোড়শী সুন্দরী অধীরা নায়ককে খুঁজিতে গিয়া যে উল্টা উৎপত্তি ঘটাইয়া বসিল, সে কোথায় গেল ? প্রণয়কুমারের বিক্রমের বৃত্তান্ত পরে অবগত হইলেও চলিবে, ঊষা তাড়াতাড়ি একেবারে উপসংহারের পাতা খুলিল।

উপসংহারে আসিয়া অধীরার দেখা মিলিল, কিন্তু বেচারা তখন অন্তিম-শয্যায়। এমন সময়ে অতি আকস্মিক উপায়ে প্রণয়কুমার তথায় উপস্থিত হইল। স্থান সম্ভবত হিমালয় কিম্বা বিন্ধ্যাচলের একটি নিভৃত গুহা, কারণ ইতিপূর্ব্বে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গের বর্ণনা হইয়া গিয়াছে। ঊষা পড়িতে লাগিল—

> অধীরা বলিল—আসিয়াছ হৃদয়বল্লভ? আমি জানিতাম তুমি আসিবে। এই সংসারে ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। শেষ মুহূর্ত্তে বলিয়া যাই, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। ভৈরব-সর্দ্দারের গৃহে যে ছদ্মবেশী নবীন দস্যু তোমার শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া দিয়াছিল, সে এই দাসী ভিন্ন আর কেহ নহে। হায়, আমাকে চিনিতে পার নাই। প্রণয়কুমার বক্ষে করাঘাত করিয়া কহিল—আমি কি দুরাত্মা! তোমার ন্যায় নিষ্পাপ সরলাকে তুষানলে দগ্ধ করিয়া হত্যা করিলাম। আমারই দুষ্কৃতিতে অদ্য একটি অম্লান অনাঘ্রাত কুসুম কাল-কবলিত হইতে চলিয়াছে। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে? অধীরা গদগদ কণ্ঠে কহিল—তোমার কোন দোষ নাই, সমস্তই অদৃষ্টের পরিহাস। আমার জন্য তুমি কত যন্ত্রণা সহিয়াছ। যাহা হউক এই পৃথিবী হইতে অভাগিনীর অদ্য চিরবিদায়। আবার জন্মান্তরে দেখা হইবে। যাই প্রাণেশ্বর। এই বলিয়া অধীরা ঝঞ্ঝাতাড়িত লতিকার ন্যায় প্রণয়কুমারের পদতলে পতিত হইল।

বই শেষ হইয়া গেল, তবু ঊষার ঘুম আর আসে না। ঐ বইয়ের

কথাই ভাবিতে লাগিল। এ সংসারে পুণ্যের জয় পাপের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে আর ভুল নাই। অতবড় দাম্ভিক দুৰ্দ্ধর্ষ প্রণয়কুমার—তাহাকেও শেষকালে অধীরার শোকে রীতিমত বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া ভাসাইতে হইয়াছে। হাঁ—বই লিখিতে হয় ত লোকে যেন গোবর্দ্ধন পালিত মহাশয়ের মত করিয়া লেখে। বিছানার ও-পাশে তাকাইয়া মনোময়ের জন্য অনুকম্পায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। আজ ভাল করিয়া কথা কহিলে না, মাঝের বালিশ দুইটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া একটুখানি টানাটানিও করিলে না, করিলে তোমার অপমান হইত—বেশ ঘুমাও, এমনিভাবে অবহেলা করিয়া নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাও—কিন্তু একদিন বুক চাপড়াইতে হইবে। উষার রাগ আরও ভয়ানক হইল, রাগের বশে কান্না পাইল। এমন করিয়া এক বিছানায় শুইয়া থাকা যায় না। উষা ভাবিতে লাগিল, এখনই একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া দূরে—বহুদূরে একেবারে চিরদিনের মত চলিয়া গেলে হয়, কাল সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া তখন প্রণয়কুমারের মত হাহাকার করিতে হইবে।

আলো লইয়া টেবিলের ধারে গিয়া সে সত্যসত্যই চিঠি লিখিতে বসিল। কিন্তু ছত্র পাঁচেক লিখিয়া আর উৎসাহ পাইল না। কারণ, দূরে—বহুদূরে—চিরদিনের মত যে-স্থানে চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার ঠিকানা জানা নাই। বাহিরে উঠানের পরপারে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় লিচুগাছটি ডালপালা মেলিয়া ঝাঁকড়া-চুল ডাইনি-বুড়ীর মত দাঁড়াইয়া আছে। আর যাহাই হউক এই রাত্রিতে দরজার খিল খুলিয়া উহার তলা দিয়া কোথাও যাওয়া যাইবে না, ইহা নিশ্চিত। অতএব চিরদিনের মত দূরে—বহুদূরে যাইবার আপাতত তাড়াতাড়ি নাই। উষা পুনরায় বিছানায় শুইতে আসিল।

আসিয়া দেখে, ইতিমধ্যে মনোময় জাগিয়া উঠিয়া মিটমিট করিয়া তাকাইয়া আছে। আলো নিবাইয়া গম্ভীরমুখে সে শুইয়া পড়িল।

হঠাৎ মনোময় ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিল—উষা, উষা—দেখছ—লিচুগাছের ডালে কে যেন ধবধবে কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে, জানালা দিয়ে ঐ মগডালের দিকে তাকিয়ে দেখ না।

উষা বুঝিল, ইহা মিথ্যা কথা। সে বড় ভীতু বলিয়া মনোময় মিছামিছি ভয় দেখাইতেছে। তবু তাকাইয়া দেখিবার সাহস হইল না, সে চোখ বুজিল। কিন্তু চোখ বুজিয়া আরও মনে হইতে লাগিল, যেন সাদা কাপড় পরিয়া তাহার মেজ-জা একেবারে চোখের সামনে ঘুরঘুর করিয়া বেড়াইতেছেন। এই বাড়িতে মেজ-জা মারা গিয়াছেন, চৈত্রে চৈত্রে এক বৎসর হইয়া গিয়াছে, লিচুতলা দিয়া তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া গিয়াছিল। উষা এমন করিয়া আর চোখ বুজিয়া থাকা বড় সুবিধাজনক বোধ করিল না। একবার ভাবিল—তাকাইয়া সন্দেহটা মিটাইয়া লওয়া যাক, মিছা কথা ত নিশ্চয়ই—ভূত না হাতী। সাহস করিয়া সে চোখ খুলিল, কিন্তু তাকাইয়া দেখা বড় সহজ কথা নয়। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ কট-কট করিয়া বাঁশবনের আওয়াজ আসিতেছে, তাকাইতে গিয়া কি দেখিয়া বসিবে তাহার ঠিক কি? মনোময়ের উপর আরও রাগ হইতে লাগিল। এতক্ষণ ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া জ্বালাইল, এখন জাগিয়া উঠিয়াও এমনি করে!

উঠিয়া তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিতে গেল, অমনি মনোময় খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া বসিল।—ও কি? কি হচ্ছে? এই গরমে জানালা বন্ধ করলে টিকব কি করে?

উষা বলিল—আমার শীত করছে—

মনোময় বলিল—বোশেখ মাসে শীত কি গো?

ঊষা বলিল—শীত করে না বুঝি! কখন থেকে একলা একলা খোলা হাওয়ায় পড়ে আছি। ঊষার গলার স্বর ভারী-ভারী।

মনোময় বলিল—আচ্ছা, আমি জানালার দিকে শুই—তুমি এই দিকে, কেমন?

ঊষা কহিল—থাক, থাক—আর দরদে কাজ নেই। দু'ফোঁটা চোখের জল গড়াইয়া আসিয়া মনোময়ের গায়ে পড়িল।

মনোময় শুনিল না—বালিশ দু'টাকে এক পাশে ফেলিয়া জোর করিয়া ধরিয়া ঊষাকে ডানদিকে শোয়াইয়া দিল। ঊষা আর নড়িল না, শুইয়া রহিল। একেবারে চুপচাপ।

খানিকক্ষণ পরে মনোময় ডাকিল—ওগো!

ঊষা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মনোময় জিজ্ঞাসা করিল—হাসছ কেন?

ঊষা বলিল—ঘুমুচ্ছিলে যে বড়!

মনোময় কহিল—তুমি যে রাগ করেছিলে বড়! এমন ভয় দেখিয়ে দিলাম—

ঊষা বলিল—না, তুমি বড্ড খারাপ। অমন ভয় আর দেখিও না। আমি সত্যি-সত্যি যেন দেখলাম, সাদা কাপড়-পরা মেজদিদির মত কে একজন। এখনো বুক কাঁপছে। তুমি সরে এস—বড্ড ভয় করে—

ভাব হইয়া গেল।

বড়জায়ের ঘরে ক্লক আছে, নিশুতি রাত্রে তাহার শব্দ আসিল।

রাত্রির রোমান্স

মনোময় বলিল—ঐ একটা বাজল—আর বকে না, এবার ঘুমান যাক।

ঊষা বলিল—একবার আওয়াজ হলেই বুঝি একটা বাজবে।! উঃ, কী বুদ্ধি তোমার! বাজল এই মোটে সাড়ে ন'টা।

মনোময় বলিল—সাড়ে ন'টা বেজে গেছে সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে।

ঊষা বলিল—না হয় সাড়ে দশটা, তার বেশি কক্ষনো নয়।

মনোময় বলিল—তারও বেশি! আচ্ছা, দেশলাই জ্বাল, আমার হাত-ঘড়িটা দেখা যাক।

ঊষা তবু তর্ক ছাড়িল না।—তা বলে এর মধ্যে একটা বাজতেই পারে না—

মনোময় বলিল—আলোটা জ্বাল আগে—

—জ্বালি। তুমি বাজি রাখ, হেরে গেলে আমায় কি দেবে?

মনোময় বলিল—যা দেব তা এখনো দিতে পারি—মুখটা এদিকে সরাও—

ঊষা বলিল—যাও!

দেশলাই ধরাইয়া কুলুঙ্গির মধ্য হইতে হাত-ঘড়ি বাহির করিয়া দেখা গেল, কাহারও কথা সত্য নয়—একটা বাজে নাই, আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে।

সর্ব্বনাশ! ঊষা শঙ্কিত হইয়া পড়িল। আবার খুব সকালে সকলের আগে উঠিতে হইবে। না হইলে রাধারাণী নামক এক ক্ষুদে ননদী আছে, সে উহাকে ক্ষেপাইয়া মারিবে।

বিছানাময় স্বচ্ছ জ্যোৎস্না। চাঁদ অনেক নামিয়া পড়িয়াছে। ঊষা হঠাৎ জাগিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। আগে বুঝিতে

পারে নাই, শেষে দেখিল তখনও ভোর হয় নাই। ভাল হইয়াছে, সেজ-জা ও রাধারাণীকে ডাকিয়া তুলিয়া রাত থাকিতে থাকিতেই ননদ-ভাজে মিলিয়া বাসন মাজা গোবর-ঝাঁট দেওয়া ও আর আর সকল কাজ সারিয়া রাখিবে, শাশুড়ী সকালে উঠিয়া দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া যাইবেন।

খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া আগের রাত্রির কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে ঊষার হাসি পাইল। বাপরে বাপ, মানুষটি এত ঘুমাইতে পারে, এখনো বেহুঁস! আগে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, মনোময় সত্যসত্যই ঘুমাইয়াছে কি-না, তারপর চুপি চুপি তাহার পায়ের গোড়ায় প্রণাম করিল। এ কয়দিন রোজ সকালেই সে প্রণাম করে, কারণ গুরুজন ত! রাত্রে ঘুমের ঘোরে কতবার হয় ত গায়ে পা লাগে। তবে মনোময়কে চুরি করিয়া কাজটা করিতে হয়, সে জানিতে পারিলে ঠাট্টায় ঠাট্টায় অস্থির করিয়া তুলিবে।

মনোময়ও একটু পরে জাগিল। তাকাইয়া দেখে, পাশে ঊষা নাই। আকাশে তখনো চাঁদ আছে। কি কাজে হয় ত বাহিরে গিয়াছে, ঘুমের ঘোরে এমনি একটা যা তা ভাবিয়া সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে জাগিয়া উঠিয়াও পাশে ঊষাকে দেখিতে পাইল না। তাহাতে অবশ্য আশ্চর্য্য নাই, রোজ সকালেই ঊষা অনেক আগে উঠিয়া যায়। সেলফ হইতে দাঁতন লইতে গিয়া মনোময় দেখিল, টেবিলে প্যাডের উপর ঊষার হাতের লেখা চিঠি রহিয়াছে। রাত্রে বসিয়া বসিয়া কি লিখিতেছিল বটে! ঊষা লিখিয়াছে—

> **তোমার কোন দোষ নাই। তুমি আমার জন্য কতই যন্ত্রণা সহিয়াছ। তুমি কতই বিরক্ত হইয়াছ। এই পৃথিবী হইতে অভাগিনীর চিরবিদায়। জন্মান্তরে দেখা হইবে, যাই—**

ইহার পর 'প্রাণেশ্বর' কথাটা লিখিয়া ভাল করিয়া কাটিয়া দিয়াছে। উষার পেটে পেটে যে এত তাহা মনোময় আগে জানিত না। এরূপ লিখিবার মানে কি? যাহা হউক সে বাহিরে গেল। অন্যদিন উষা এই সময়ে রান্নাঘরের দাওয়া নিকায়। আজ সেখানে নাই। এবার একটু শঙ্কা হইল। মেয়েরা ত হামেশাই আত্মহত্যা করিয়া বসে, যখন তখন শুনিতে পাওয়া যায়। খিড়কীর পুকুর বেশি দূরে নয়, জলও গভীর। কিন্তু কি কারণে উষা যে এত বড় সাংঘাতিক কাজ করিবে তাহা বুঝিতে পারিল না। রাত্রে ঘুমের ঘোরে হয় ত সে কি বলিয়াছে! আনাচ-কানাচ সকল সন্দেহজনক স্থান দেখিয়া আসিল, উষা কোথাও নাই। এমন মুশকিল যে একথা হঠাৎ মুখ ফুটিয়া কাহাকে জানাইতে লজ্জা করে। পোড়ারমুখী রাধারাণীটাও সকাল হইতে কোথায় বাহির হইয়াছে যে তাহাকে দু'টা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে! অবশেষে মনোময় বড়বৌদিদির ঘরে ঢুকিল, সে-ঘর ইতিপূর্ব্বেই একবার খুঁজিয়া দেখা হইয়াছে। বড়বধূ বিছানা তুলিতেছিলেন, বোধকরি মনোময়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, হাসিয়া বলিলেন—হারানিধি মিলল না? না ভাই, আমি চোর নই। ঘর ত আমাদের অজান্তে একবার দেখে গিয়েছ, এইবার বিছানাপত্তর ঝেড়েঝুড়ে দেখাচ্ছি—এর মধ্যে সেরে রাখি নি।

মনোময় বলিল—ঠাট্টার কথা নয় বৌদিদি, ছোট বউ কোথায় গেল বল দিকি? এই দেখ চিঠি—বলিয়া চিঠিখানা দেখাইল।

চিঠি পড়িয়া বড়বধূ গম্ভীর হইয়া গেলেন। বলিলেন—কি হয়েছিল বল ত—এ ত ভয়ের কথা!

মনোময় প্রতিধ্বনি করিল—সাংঘাতিক ভয়ের কথা।

—তোমার দাদাকে বলি তবে ?

বিমর্ষ মুখে মনোময় কহিল—না বলে উপায় কি ?

বড়বধূ বলিলেন—ভাল করে খুঁজে টুজে দেখেছ ত ?

কোথাও বাকি রাখি নি, বৌদি !

—গোয়ালঘর সিঁদুরে-আঁবতলা ?

—হুঁ ।

—চিলেকোঠা ?

—হুঁ ।

—তোমার নিজের ঘরে ? সিন্দুকের তলায় কি বাক্সের পাশে ? দুষ্টু মি করে লুকিয়ে টুকিয়ে থাকতে পারে ।

মনোময় বলিল—তা-ও দেখছি, তন্নতন্ন করে দেখেছি ।

বড়বধূ হতাশভাবে বলিলেন—তবে কি হবে ? আচ্ছা, সিন্দুকের ভিতরে, বাক্সের ভিতরে ? বলিতে বলিতে হাসিয়া ফেলিলেন ।

মনোময় মাথা নাড়িয়া বলিল—বৌদি, ব্যাপার কিন্তু সহজ নয়—

বড়বধূ বলিলেন—নয়ই ত ! আচ্ছা এস ত আমার সঙ্গে, আমি একটু দেখি—

বলিয়া মনোময়কে সঙ্গে করিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ ঘরটা দেখেছ ?

এত সকালে রান্নাবান্না নাই—এ ঘরে আসিবে কি করিতে ?

কিন্তু ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, থালার উপর লঙ্কা ও লবণ সহযোগে কাঁচা আম জারান হইয়াছে । মুখোমুখি বসিয়া উষা ও রাধারাণী নিঃশব্দে মনোযোগের সহিত আহার করিতেছে । মনোময়কে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া উষা হাত গুটাইয়া লইল । রাধারাণী হাসিয়া উঠিল ।

প্রেতিনী

*

চণ্ডীদহের মুখে পড়িয়া ডিঙি টলমল করিতে লাগিল। একে ত গাঙে ভয়ানক টান, তার উপর উল্টা বাতাস। মাঝির কলিকায় আগুন কেবলমাত্র ধরিয়া উঠিয়াছে। হরিচরণ বলিল—না, না মাঝি, তামাক খাওয়া রেখে দুই হাতে বোঠে চালাও দিকি—এবং মাঝির সেই কলিকা নিজের দুই হাতে চেটোর মধ্যে রাখিয়া অভিনিবেশ সহকারে টানিতে আরম্ভ করিল। হইলে কি হয়, শান্তিতে তামাক খাওয়া তাহারও কপালে নাই। ছইয়ের ভিতরে চুড়ির আওয়াজ। চুড়ি অবশ্য নানা কারণে বাজিতে পারে—নিচু ছই, উঠিতে বসিতে হাত লাগিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু একবার—দুইবার—তিনবার, কলিকা রাখিয়া উঠিতে হইল—

ভিতরে ঢুকিয়া দেখে একটা টিনের ট্রাঙ্ক, সেইটা দুই হাতে জোর করিয়া ধরিয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া প্রভা বসিয়া আছে। হরিচরণকে দেখিয়া একটু হাসিবার মত ভাব করিল। কহিল—নৌকো কি রকম টলমল করছে দেখ না—আর তুমি বসে বসে বেশ তামাক খাচ্ছিলে—

হরিচরণ বলিল—ভয় হচ্ছে না-কি তোমার?

প্রভা বলিল—কিসের ভয়? না, আমার ভয়-টয় নেই মশায়।..ওঃ, সর্ব্বনাশ! তুমি যে অত কাছে এসে বসলে—মাঝে মোটে পাঁচ-সাত হাত জায়গা। আর একটুখানি দূরে গিয়ে বসতে হয়। মাঝিরা দেখলে ভাববে কি?

এটা প্রভার মিথ্যা কথা। দুইজনের মাঝে যে ফাঁকটুকু ছিল, তাহা পাঁচ-সাত হাত ত নয়, হাত দুয়েকও হইবে না। কিন্তু প্রভার কাঁচা বয়স, বিয়ে মোটে বছর দুই আগে হইয়াছে, যা বলে তাহাতে তর্ক করিতে নাই। হরিচরণ সরিয়া একেবারে পাশে আসিল। অমনি প্রভা তাহার কোলের উপর চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল।

একটু পরে মাথা তুলিয়া বলিল—আচ্ছা, আজকে যদি এখানে নৌকো ডুবে যায়—

হরিচরণ রাগ করিয়া উঠিল—ও-সব কি কথা! গাঙের উপর ভর-সন্ধ্যেবেলা অমন বলতে নেই—

প্রভা নিষেধ মানিল না।—ধর যদি ডুবেই যায়, আমি ত মোটেই সাঁতার জানিনে—তুমি কি কর তা হলে?

—কি করি? দিব্যি হাসতে হাসতে গাঙ পাড়ি মেরে একলা ঘরে ফিরে যাই। তুমি কি ভাব বল দেখি?

প্রভা বলিল—না, তা কক্ষনো যাও না। সত্যি—তুমি কি কর আমার শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে, বল না।

—তোমাকে জড়িয়ে ধরে সাঁতার কাটি।

প্রভা তবু ছাড়ে না।—আর কোন গতিকে যদি তোমার হাত ফসকে যায়? আমি ত অমনি চণ্ডীদ'র অথই জলে তলিয়ে যাব, তা হলে কি করবে?

হরিচরণ বলিল—তোমার আর কথা নেই আজ?

প্রভা জেদ করিয়া বলিল—না, বল কি কর তা হলে? বলবে না? আচ্ছা, থাকগে। মুখ ভার হইয়া উঠিল।

—তা হলে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে আমিও অমনি ডুবে মরব। ঐ গাঙের তলায় ফের যুগল-মিলন হবে।

প্রভা ঘাড় নাড়িয়া কহিল—ইঃ, তা আর হতে হয় না! সাঁতার-জানা মানুষ সাঁতার না দিয়ে ইচ্ছে করে ডুবে মরতে পারে কখনও?

—বিশ্বাস কর না?

প্রভা বলিল—না।

—তোমায় ছেড়ে আমি সত্যি-সত্যি বেঁচে থাকব, এই তুমি ভাব?

প্রভা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—ভাবি না ত কি! বেঁচে থাকবে এবং পছন্দমত তিন নম্বরের জন্য তক্ষুনি ঘটক লাগাবে। পুরুষমানুষের আবার ভালবাসা!

হরিচরণ বলিল—বেশ, তবে তাই। তোমায় আমি ভালবাসিনে, আদর করিনে, জ্বালাতন করি, এই ত? ভাল ভাল কাপড় গয়না দিতে পারিনে, আমি গরিব মানুষ—আমার আবার ভালবাসা! বেশ—বেশ! বলিয়া সে অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া মনোযোগের সহিত স্বভাবের শোভা দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। শেষে প্রভাই কথা কহিল—ওদিকে একনজরে চেয়ে কি দেখছ? ওগো, কি দেখছ বল না! গরু? মাছরাঙা? জেলেদের বউ? কই, জবাব দিলে না যে!

হরিচরণ নিরুত্তর।

প্রভা উঠিয়া বসিল। তারপর খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল—রাগের পুরুষ, অত রেগো না—তুমি ভালবাস, ভালবাস—একুঝুড়ি, দশঝুড়ি, দশ হাজার ঝুড়ি ভালবাস। হল ত! সহসা জোর করিয়া

দুইহাতে হরিচরণের মুখ নিজের দিকে ফিরাইয়া বলিতে লাগিল—তুমি ওদিকে তাকাতে পাবে না, কক্ষনো না—এই বলে দিলাম। মাঝগাঙে আমার একা একা ভয় করে না বুঝি! কই, তাকাও আমার দিকে—কথা কও—

কাজেই কথা বলিতে হইল। বলিল—কি কথা?

প্রভা কহিল—আমি শিখিয়ে দেব না-কি? আচ্ছা, বল—আর কোনদিন আমি তামাক খাব না, কারণ মুখ দিয়ে ভারী বিশ্রী গন্ধ বেরোয়, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী পছন্দ করেন না—বল, বল—

হরিচরণ বলিল—মুখের কথা ফস করে ত বলে ফেললে! প্রথম যখন তামাক খাওয়া প্র্যাকটিশ করি সে কৃচ্ছ্র-সাধনের ইতিহাস ত শোন নি। নিমু দাসকে দেখেছ—কৈবর্ত্তপাড়ার নিমাই?

প্রভা গল্প শুনিতে ভারী ভালবাসে। গল্পের গন্ধ পাইয়া তৎক্ষণাৎ পরম উৎসাহে সায় দিল—হুঁ।

—ঐ নিমুর সঙ্গে খুব ভাব করেছিলাম। রোজ দুপুরে ইস্কুল পালিয়ে তার বাড়ি যেতাম। আমাকে দেখে খুব খাতির করে ছাঁচতলায় কোদালখানা নামিয়ে দিত—দিয়ে নিমু নিজেই যেত তামাক সেজে আনতে। ফিরে আসতে একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা দেরি হত—যত্ন করে তামাক সাজত কি-না! ততক্ষণ হলুদের ভুঁই তৈরি করবার ব্যবস্থা। ঠিক-দুপুরে রোদ্দুরে ঘণ্টাদেড়েক ধরে জমি কোপান—একবার ভাব ত ব্যাপারখানা!

প্রভা কহিল—ওমা আমার কি হবে! এতখানি কষ্ট করতে তামাক খাওয়ার জন্যে?

হরিচরণ কহিল—এই শেষ না-কি? একদিন কথাটা কেমন করে বাবার কানে উঠল। একটা আস্ত কঞ্চি ভাঙলেন পিঠের

উপর। সংসারে একেবারে ঘেন্না ধরে গেল। বললে বিশ্বাস করবে না, তখন ত মোটে বার-তের বছর বয়স—শেষ রাতে 'জয় গুরু' বলে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গের সম্বল একটা দেশলাই, এক কোটো তামাক এবং বাবার নকসি-কাটা শখের কলকেটা—

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় গেলে?

হরিচরণ বলিল—কিছু ত ঠিক করে বেরুই নি। যাচ্ছি ত যাচ্ছি। মাঝে মাঝে গাছতলায় বসে তামাক সেজে নিচ্ছিলাম। গোড়ায় ফুর্তিও ঠেকছিল খুব—একেবারে মাঠের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে সকলের সামনে দিয়ে ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া উড়িয়ে চলে যাওয়া! কিন্তু সারাদিন ঐ ধোঁয়া ছাড়া পেটে আর কিছু পড়ল না। সন্ধ্যেবেলায় মহাবিপদ, তামাক গেল ফুরিয়ে—

প্রভা কহিল—তারপর?

—তারপর বোধগম্য হল যে সন্ন্যাসে মজা নেই। কিন্তু আপাতত এক ছিলিম তামাক এবং রাত কাটাবার একটুখানি জায়গার ত দরকার, শেষে ভাত-টাত জোটে ভালই। একজন চাষা শুকনো খেজুরপাতার আটি নিয়ে যাচ্ছিল, ডাক দিলাম—ও মিয়া সাহেব, তোমার হাতের কলকেয় কিছু আছে না-কি? সাফ জবাব দিল—না। ফের জিজ্ঞাসা করলাম—এ গাঁয়ের নাম কি? বলল—কমলডাঙা।

প্রভা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—কমলডাঙা? ঐখানেই ত দিদির বাপের বাড়ি—না?

হরিচরণ প্রশ্ন করিল—দিদি? তোমার আবার দিদি কে? চিনলাম না ত।

প্রভা বলিল—আমার দিদি। সরযূ—সরযূ, আমার আগে যিনি ছিলেন গো। তুমি প্রথমে কমলডাঙায় বিয়ে কর নি?

হরিচরণ বলিল—উঁহু, কলমিডাঙায়। কমলভাঙা সেই কোথায়—সাতসমুদ্দুর পার। আর কলমিডাঙা ঐ সামনে—খান পাঁচ-সাত বাঁকের পর গিয়ে পড়ব।

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল—তাই না কি? আমাদের এই নৌকো দিদির বাপের বাড়ির গাঁ দিয়ে যাবে?

হরিচরণ বলিল হুঁ, তা ছাড়া আর পথ কই? ও মাঝি, নৌকো কলমিডাঙার খাল দিয়ে উঠবে ত?

কিন্তু মাঝি কি বলে শুনিবার মোটেই অপেক্ষা না করিয়া প্রভা বলিল—আমি নামব কিন্তু. নেমে এক দৌড়ে দিদির বাপের বাড়ি গিয়ে সব দেখে শুনে আসব। হাসছ যে—হাসলে শুনব না। যাব আর আসব, একমিনিটও সেখানে থাকব না, কেমন?

হরিচরণ বলিল—যাঃ, তা কি হয়?

—কেন হবে না? দিদির বাবা-মা বুঝি আমার পর! আমি যাব—কিচ্ছু দোষ হবে না—

হরিচরণ বলিল -দোষের কথা কে বলছে? ঘাট থেকে সে বাড়ি অনেক দূর

প্রভা কহিল—অনেক দূর? দু-কোশ দশকোশ? যাও—ও তোমার যেতে না দেবার কথা!

ইহারও উত্তরে হরিচরণ একটা-কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু প্রভা শুনিলই না। সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ও শুনেছি, যখন সেই ঘাটে যাব আমায় বোলো। হ্যাঁ—তুমি যা বলবে তা আমি জানি। ও মাঝি, কলমিডাঙায় নৌকো গেলে আমায় বোলো, একটু নামব।

বুড়া মাঝি স্বীকার করিল।

প্রভা পুনরায় আরম্ভ করিল—দিদি মারা যান এই কলমিডাঙায় —না?

হরিচরণ বলিল—হ্যাঁ, বাপের ভিটে যেন ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল। এসে দশটা দিনও কাটল না। সে ত তুমি সব শুনেছ।

সে গল্প প্রভা আগেই শুনিয়াছে। হরিচরণ অবশ্য সর্ব্বদা চাপা দিতে যায়, কিন্তু প্রভাকে পরিবার জো আছে! একটা একটা করিয়া সব শুনিয়া তবে ছাড়িয়াছে।

বছর চার আগের কথা, তখন হরিচরণ চৌধুরী-সেরেস্তায় নায়েবি করিত। আষাঢ়-কিস্তির টাকা আদায় হইয়াছে, সেই টাকা লইয়া কলিকাতায় জমিদার-বাড়ি যাইবে। পানসিও ঠিক হইয়া গিয়াছে। ক'দিন পরে রথ, মতলব আছে কলিকাতা হইতে অমনি রথের বাজার সারিয়া আসিবে - গোটা পাঁচ-সাত কলমের আঁবের চারা, এক সেট ছিপ-সূতা-বড়শি, সরযূর জন্য একখানা হাতীপাড় মটকার শাড়ী— পাড়টা একটু পছন্দ করিয়া কিনিতে হইবে, অমন গায়ের রঙের সঙ্গে যাহাতে মিল হয়। এই সমস্ত ঠিক হইয়া আছে, কিন্তু হঠাৎ সরযূ বাধাইল মুশকিল।

সন্ধ্যার সময় কেহ কোথাও নাই, হরিচরণ নিজের মনে টাকার চালান ঠিক করিতেছিল—হঠাৎ সরযূ আসিয়া সামনে বসিল। হরিচরণ একবার চাহিয়া দেখিতেই বিনা ভূমিকায় বলিল—আমি তোমার নৌকোয় কলমিডাঙায় যাব। চালানের যোগটা যাহাতে নির্ভুল হয় হরিচরণের মন ছিল সেই দিকে, শুধু বলিল - হুঁ। সরযূ অমনি তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—তা হলে জিনিষপত্তর গুছিয়ে নিগে?—হরিচরণ প্রশ্ন করিল—কি—কি বলছ? কিন্তু সরযূ অনাবশ্যক উত্তর দিবার জন্য একমুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না। পরে চালান

লেখা শেষ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া যখন সরযূর দেখা মিলিল, তখন তাহার বাক্স গোছান প্রায় সারা। কলমিডাঙায় রথের সময় বড় ধূমধাম হয়। হরিচরণের এই পানসিতে চড়িয়া সরযূ যেখানে যাইবে, চাঁপা-তলার ঘাট পথেই পড়ে—সেইখানে তাহাকে নামাইয়া দিতে হইবে, তারপর শুধু রথের মেলার ক'টা দিন বাপের বাড়ি থাকিয়া আবার হরিচরণের ফিরতি-বেলায় সেই নৌকাতেই ফিরিয়া আসিবে—এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই পাকা হইয়া গিয়াছে, আর তাহার নড়চড় হইবার উপায় নাই। হরিচরণ একটু প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিল, সরযূ বলিল—বাঃ রে, তুমি যে 'হুঁ' বললে, আগে রাজি হয়ে শেষকালে —এবং মুখের উপর মেঘ ঘনাইয়া আসিল। কাজেই বরকন্দাজকে একটু বড় দেখিয়া পানসি আনিতে বলিয়া দেওয়া হইল। শ্বশুর-মহাশয়কেও চিঠি লেখা হইল, বুধবারে দিনের ভাঁটায় খালের ঘাটে যেন পাল্কি-বেয়ারা উপস্থিত থাকে।

এই যে এত জেদ করিয়া বাপের বাড়ি আসা, কিন্তু চাঁপাতলার ঘাটে যখন নৌকা লাগিল সরযূ কেমন হইয়া গেল—যেন নামিবার উৎসাহ পায় না। নামিতে গিয়া ফিরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তারপর হরিচরণের কাছে আসিয়া বলিল—আমি যাব না, তুমি এস, না হলে একা একা আমি কক্ষনো যাচ্ছি নে। কিন্তু হরিচরণের ত নামিবার উপায় নাই। সঙ্গে বিস্তর কাঁচা টাকা—লাটের কিস্তি আসিয়া পড়িয়াছে, টাকাটা ঠিক সময়ে পৌঁছিয়া দেওয়া দরকার, পথে একটুও দেরি করিবার জো নাই। মেয়েমানুষে এ সব বোঝে না। সরযূর ধারণা, হরিচরণ ঠিক রাগ করিয়াছে। রাগ যে করে নাই, তাহা যতই বলা যায় কিছুতে বিশ্বাস করিবে না। কেবলই বলে—জেদ করে এসেছি বলে তুমি ঠিক রাগ করেছ, ঠিক—ঠিক—

তোমার মুখ দেখে বুঝেছি—আমাকে ঠকাতে পারবে না—হাসলে কি শুনি? বিপুল বেগে হাস্য করিলেও ভুলিবে না, এমনি মুশকিল। ওদিকে ঘাটের উপর শ্বশুর মহাশয় স্বয়ং পাল্কি-বেয়ারা সহ উপস্থিত। হরিচরণ একবার নামিয়া প্রণাম করিয়া এবং সবিশেষ নিবেদন করিয়া বিদায় লইয়া আসিয়াছে। এখন তিনি ঠায় রৌদ্রে দাঁড়াইয়া, অথচ মেয়ে-জামাইয়ের বিদায়ের পালা আর সাঙ্গ হয় না। হরিচরণ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল—যাও, যাও, শ্বশুর মশায় কি ভাবছেন বল ত? সরযূর সেই আগের কথা—রাগ কর নি? আচ্ছা। গা ছুঁয়ে বল। হ্যাঁ, বল যে ফিরতি-বেলা সঙ্গে নিয়ে যাবে—

সরযূর গা ছুঁইয়া হরিচরণ বলিল নিয়ে যাব।

সে শপথ রক্ষা হয় নাই।

এ সব পুরানো কথা। ডিঙি চড়িয়া আজ রাত্রে দু'জনে সরযূর বাপের বাড়ির ঘাট দিয়া চলিয়া যাইবে, ইহা শুনিয়া অবধি প্রভার কেবলই নানারূপ মনে উঠিতে লাগিল। নৌকায় উঠিয়াই ছইএর একদিকের অনেকখানি খড় ছিঁড়িয়া সে মস্ত বড় ফাঁক করিয়া লইয়াছে, সেখান হইতে উত্তরের পাড় বেশ দেখা যায়। সেই ফাঁক দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া যে-সতীনকে জীবনে কোনদিন দেখে নাই তাহার কথাই ভাবিতেছিল। হরিচরণও চুপ করিয়া বসিয়া। ছপ-ছপ করিয়া দাঁড়ের আওয়াজ···এক-একবার ধনুকের তারের মত পাশ কাটাইয়া জেলে-ডিঙি আগাইয়া যাইতেছে। হঠাৎ মাঝি চেঁচাইয়া উঠিল—বাঁয় দাঁড় মার—ডাইনে দ'—গাজী বদর বদর—। অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। একটা পাখী জলের ধারে

কোথায় বসিয়াছিল, মাঝির চিৎকারে ফরফর করিয়া ডিঙির উপর দিয়া ও-পারে উড়িয়া গেল।

প্রভা মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল - আজকে অমাবস্তে ?

হরিচরণ বলিল—উঁহু। অমাবস্তে কাল, নিশিপালন উপোষ তুই-ই। অমাবস্তের খোঁজ কেন ?

প্রভা কহিল—দিদি যেদিন মারা যান সেদিনও ঘোর অমাবস্তে শুনেছি—না ?

হরিচরণ প্রভার মুখের দিকে চাহিল। বলিল—এখনও ঐ কথা ভাবছ ? যা চুকে বুকে গেছে, সে-সব আবার কেন ?

প্রভা কাতর-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ওগো, আজ যদি আবার অমনি চুকে যায়, আমার কথাও আর তুমি ভাববে না তা হলে ?

হরিচরণ বলিতে লাগিল—শোন কথা ! তুমি আজ হলে কি ? যখন তখন যা তা বলা ভারী আদিখ্যেতা। না, অমন বলে না, কি কথা কেমন ক্ষণে পড়ে যায়, কিছু বলা যায় কি ?

প্রভা একটু হাসিল।

হরিচরণ বলিল—হাসছ ? আমি ঐ রকম কালাকাল মানতাম না—পাঁজি-টাজি ডোণ্ট্‌কেয়ার করতাম। শোন তবে, সরযূকে নামিয়ে দিয়ে ত কলকাতায় গেলাম। কাছারি থেকে খবর গেল, বিপিন সা জোর করে মহালের বাঁধ কেটে দিয়েছে। সেদিন অমাবস্তে, তার পর সূর্য্যিগেরোন। খাজাঞ্চি মশায় বললেন—এমন দিনে কখনও বেরুবেন না, শাস্ত্রে পই-পই করে বারণ আছে। না শুনে রওনা হলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, চাঁপাতলার ঘাটে নৌকো বেঁধে নিজে গিয়ে সরযূকে তুলে আনব—এত করে

বলে দিয়েছিল! যাত্রার ফল অমনি সঙ্গে সঙ্গে। ঘাটে পৌঁছে দেখি, আমাকে আর যেতে হল না—সে-ই এসেছে।

এ-কথা ত প্রভা শোনে নাই। জিজ্ঞাসা করিল—এসেছিলেন? আমরা শুনেছি যে আর দেখা হয় নি।

হরিচরণ বলিল—হাঁ প্রভা, এসেছিল, দেখাও হয়েছিল। চাঁপাতলায় নয়, তার রশিটাক পশ্চিমে বটতলার শ্মশানঘাটে। বলিতে বলিতে সে চুপ করিয়া গেল।

তখন উত্তর-বিলে ঝোড়োকোণায় একসারি তালগাছের মাথার উপর ক্রমে আঁধার করিয়া আসিতেছে, একটা একটা করিয়া তারা ঢাকিয়া যাইতেছে। প্রভা হঠাৎ কহিল—একটা কথা বলব?

—কি?

—আজকে নৌকো এখানে বেঁধে রাখ, কালকের জোয়ারে যাব।

হরিচরণ বলিল—তাতে লাভ কি?

প্রভা বলিতে লাগিল—তুমি অমত কোরো না। এই রাত্তিরে কলমিডাঙায় গেলে তুমি কক্ষনো আমায় নামতে দেবে না, তা জানি। কালকে সেই অমাবস্যে, কাল দিনমানে ঘাটে নৌকো বেঁধে আমি দিদির বাবার ওখানে ছুটে যাব। গিয়ে বলব, আমি এসেছি—ঘরে নাও। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, অমত কোরো না। আমার বাবা নেই, কাল দিনমানে আমি বাবার কাছে যাব। বলিতে বলিতে হরিচরণের পায়ের কাছে পড়িয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। এমনি ছেলেমানুষ!

কিন্তু সত্যসত্যিই ত মরা-সম্পর্কের কুটুম্ববাড়ি বিনা খবরে অমন করিয়া নূতন বউকে তোলা যায় না। লোক বলিবে কি? হরিচরণ

প্রভাকে শান্ত করিতে লাগিল—ছিঃ, কাঁদে না, আচ্ছা পাগল তুমি! একবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ ত, তা কখনও হয়?

প্রভা মাথা তুলিয়া বলিল—কি হয় না?

—বলছি, তুমি ওঠ। দেখ, ভগবান যাকে নিয়ে গেলেন তার জন্মে হা-হুতাশ করে ফল কি? ও ভুলে থাকাই ভাল।

প্রভা আগুন হইয়া উঠিল।—জানি, জানি, তোমরা তা খুব পার। তোমরা ভালবাস না ছাই! সব মুখস্থ-করা কথা। আজ যদি ঝড় ওঠে, নৌকো ডুবে যায়, আমি মরি—কালকেই আর একজনের সঙ্গে কত সোহাগ হবে! তখন আমার কথা কেউ বলতে গেলে অমনি মুখ চেপে ধরবে—

হরিচরণ হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল—রাগ করে চোখ বুজে আছ না-কি? গাঙ ছাড়িয়ে নৌকো যে খালে ঢুকেছে। এখানে মোটে হাঁটু জল। নৌকো ডুবলেও আমরা ডুবব না, দেখ না তাকিয়ে।

প্রভা রাগ করিয়া জবাব দিল না, তাকাইয়াও দেখিল না।

নৌকা তখন খালে ঢুকিয়া তরতর বেগে যাইতেছিল। প্রভা বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আকাশে তারা নাই, চারিদিক আঁধার—ভাল করিয়া ঠাহর করিলে ঝাপসা দেখা যায়। খালের ধারে কাহাদের লাউ-মাচা, জোয়ারের জল তাহার নিচে অবধি তলাইয়া দিয়াছে। প্রভার নড়াচড়া নাই। চরের ধারে সারি সারি ক'খানা ঘর ও খড়ের গাদা দিগন্ত-বিসারী ধানক্ষেত পাহারা দিতেছে। হঠাৎ তাহারই মধ্যে কোন্ দাওয়া হইতে খঞ্জনী বাজিয়া উঠিল। আকাশভরা মেঘ, কোনো পারে একটা লোকের ছায়া দেখা যায় না। প্রভা বসিয়াই আছে—যেন একখানি

ছবি, ছইয়ের ভিতরে অন্ধকার পটের উপর পাকা ধানের রঙ দিয়া ছবি আঁকানো। হরিচরণও চুপ করিয়া ছিল। কিন্তু কতক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা বড় অসহ্য ঠেকিল। প্রভার হাত ধরিয়া নাড়িয়া বলিল—শুনছ? শুনছ?

—কি?

শোঁ-শোঁ করিয়া অনেকদূর হইতে শব্দ আসিতে লাগিল, দূরের কোন গাঁয়ে বাদল নামিয়াছে। হরিচরণ বলিল—অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কি দেখছ? এদিকে ফের না। এখনেও রাগ আছে নাকি?

প্রভা কহিল—রাগ কিসের?

—রাগ নয় ত কি? কেবল ঐ রাগটাই যা তোমার দোষ, নইলে তোমায় আমার এমন ভাল লাগে!

এবার প্রভা মুখ ফিরাইল, একটুখানি হাসি ঠোঁটে ফুটিল। বলিল—সত্যি না-কি?

হরিচরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—নিশ্চয়ই, বুক চিরে দেখাতে পারি—

প্রভা কহিল—দেখাও না একটু। তারপর হাসিতে হাসিতে অতি তরলস্বরে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, ঐ কথাটা—ঠিক ঐ কথাটা কতবার তুমি দিদিকে বলেছ, আমায় বলতে পার?

হরিচরণ মুষড়াইয়া গেল। সরযূর ভূত তবে তাহাকে এখনও ছাড়ে নাই! হয় ত রাতে দুপুরে মাঝে মাঝে যখন মাথার ঠিক থাকে না, সরযূকে এইরূপ কোন কোন কথা বলিয়া থাকিবে, কে তাহা মনে করিয়া রাখিয়াছে? সকলেই এমন বলিয়া থাকে,

কিন্তু সে-সব স্বীকার করিবার জায়গা ইহা নয়। তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল – কক্ষনো না, একদিনও না —

প্রভা কহিল—কি সাধুপুরুষ! একদিনও না? হাত-পা ছেড়ে দিয়ে গাঙের তলায় যুগল-মিলন হবার কথা-টথা দিদিকে কোনোদিন বল নি—যেমন আজকে আমায় বলছিলে?

প্রভা খুশি হইতেছে বুঝিয়া হরিচরণ আরও উৎসাহে প্রতিবাদ করিতে লাগিল—যাকে-তাকে একথা বলা যায় না-কি? ও তোমাকেই শুধু বললাম—বুঝলে প্রভা, সে শুধু নামেই তোমার সতীন, ভালবাসার ভাগ পায় নি—

ঠিক এমনি সময়ে মাঝি বলিয়া উঠিল—কলমিডাঙায় এলাম মা-ঠাকরুণ—। কশাড় হোগলাবনের মধ্যে ঢুকিয়া হোগলার আগা কাঁপাইতে কাঁপাইতে নৌকা ডাঙায় আসিয়া লাগিল। হরিচরণের মুখের হাসি নিবিয়া গেল। তাহার কেমন মনে হইল, যাহাকে কোনোদিন ভালবাসে নাই বলিতেছিল, সে যেন কথাটা আশপাশ কোনখান হইতে শুনিয়া ফেলিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এ ঠিক সরযূরই কান্না, সুরের তীব্রতায় যেন সহস্রগুণ জোরে আসিয়া বুকে লাগিতেছে। বাতাস উঠিয়াছে। ঘাটের উপরে বাঁশঝাড়, নিরন্ধ্র অন্ধকার—সেখানে কটর-কটর-কট সে যে কি শব্দ উঠিতেছে, যেন কে সমস্ত চিবাইয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া একাকার করিয়া ফেলে আর কি! সেই অন্ধকারে কিছু দূরে বাঁওড়ের কিনারায় হরিচরণ অকস্মাৎ যেন সরযূকে দেখিতে পাইল। সরযূকে সে কতকাল চোখে দেখে নাই, মন হইতে সে যেন মুছিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ দেখিল, তেমনি খুব ফরসা এবং কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা টকটক করিতেছে, পরণে লালপাড় শাড়ী, রং কাঁচা হলুদের ন্যায়—সে যে তাহাতে কোনো

ভুল নাই। সরযূ আজ অন্ধকারের মধ্যে আশশ্যাওড়া ও ভাঁটের জঙ্গল ভাঙিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিতেছে। বাঁওড়ের বাঁশের সাঁকো পার হইতে পারিল না, সেখান হইতে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ডাকিতেছে—আমায় ফেলে যেও না, নিয়ে যাও—নিয়ে যাও। হরিচরণ চোখ বুজিল, হাত দিয়া কান ঢাকিল, তবু কানে ঢুকিতে লাগিল ঝড়ের একটানা শব্দ—উ-উ-উ ভাষাহীন একটানা কান্না। মনে হইল, ঐ শব্দ আসিতেছে সাঁকোর ওপার হইতে, সেখানে মুখ থুবড়াইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া সরযূ কাঁদিতেছে। সে উহাদের কথা-বার্তা শুনিতে পাইয়াছে—শুনিয়া বুক চাপড়াইয়া বিজন শ্মশান-ঘাটায় একলা প্রেতিনী মানুষের ভালবাসার জন্য মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। মড়-মড় করিয়া একটা গাছ ভাঙিয়া পড়িল। যেন সাঁকো পার হইয়া চলিয়া আসিল এবার! চেঁচাইয়া বলার দরকার—মাঝি, মাঝি, বোঠে ধর, দাঁড় লাগাও, পালাও, পালাও—

দরকার ত বটে, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

উপসংহার

*

নবগোপাল কবিতা লেখে, সে কবিতা মাসিকপত্রে ছাপা হয়।

জনার্দ্দন সেন নেবুতলায় থাকেন। লোহার কারবার করেন বটে, কিন্তু ভদ্রলোক রসগ্রাহী। আজ বছর পাঁচেক সেন মহাশয়ের সহিত নবগোপালের পরিচয় হইয়াছে, শ্যামবাজার হইতে নেবুতলা অবধি হাঁটিয়া মাঝে মাঝে সে কবিতা শুনাইতে আসে। জনার্দ্দন দিব্য চোখ বুজিয়া শুনিয়া যান, কোন তর্ক তুলিয়া গোলমাল করেন না এবং উপসংহারে নবগোপালের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক মিষ্টকথা বলিয়া থাকেন।

কি করিয়া যে তরুণ কবি এবং প্রবীণ লোহার ব্যাপারীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছিল তাহা জানি না। তোমরা ভাবিবে, ইহার মূলীভূত হেতু কাতু অর্থাৎ কাত্যায়নী—জনার্দ্দনের মেয়ে। কিন্তু সে কথা আর বলিবার জো রহিল না, ২৪শে তারিখে কাতুর বিয়ে হইয়া যাইতেছে, নবগোপালের মেসে আজ নিমন্ত্রণের চিঠি আসিয়াছে।

তা ছাড়া আজ না হয় কাতু ভারিক্কি হইয়াছে, পাঁচ বছর আগে ছিল একফোঁটা এতটুকু মেয়ে, বজ্জাতের শিরোমণি। তাহার সঙ্গে প্রেম! জনার্দ্দনের সহিত কাব্য-আলোচনা মাসাবধি চলিবার পরে নবগোপাল কাতুকে দেখিয়াছিল, তাহার আগে কাতু বলিয়া কেহ আছে জানিতই না।

এক রবিবারে দুপুর বেলা নবগোপাল কবিতা পড়িতেছে। সাত দিনের মধ্যে গড়ে তিন-সাতে একুশ নয়, তাহার দুইটা কম—

উনিশটা কবিতা লিখিয়াছে। তাহার মধ্যে চার-পাঁচটা এমন অদ্ভুত হইয়াছে যেন চোখের জল টানিয়া নিয়া আসে। নবগোপাল পড়িয়া যাইতেছিল, জনার্দ্দন চোখ বুজিয়া গূঢ়মর্ম্ম উপলব্ধি করিতেছিলেন। খানিক পরে গড়গড়ার টান বন্ধ হইল, অতিরিক্ত ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া থাকে। নবগোপাল পড়িয়া যাইতে লাগিল। সহসা সন্দেহ জাগিল, গড়গড়ার টান বন্ধ হইল ভাবাবেশে কিম্বা নিদ্রাবশে? ডাকিল—জনার্দ্দনবাবু, শুনছেন? জনার্দ্দনের সাড়া নাই।

—দুত্তোর! বলিয়া সে কবিতার খাতা বন্ধ করিল।

এই সময়ে নজর পড়িল, দুয়ারের কাছে ডুরে কাপড়-পরা একটি ছোট মেয়ে মুখ বাড়াইয়া মিট-মিট করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। মেয়েটির দিকে চাহিতেই হাসিয়া মুখ লুকাইল। নবগোপাল ডাকিল—ও খুকী, এস না—এস এখানে। খুকী দিল এক ছুট— ঝমর-ঝমর করিয়া মল বাজিতে বাজিতে মিলাইয়া গেল। বেশ ত—খাসা ত—খঞ্জন পাখী কখনো চোখে দেখে নাই, শুনিয়াছে সে পাখী নাচিতে নাচিতে পলাইয়া যায়।

হঠাৎ জনার্দ্দন চোখ খুলিলেন—কই? থামলে কেন? পড়—

এই প্রথম দেখা।

একদিন নবগোপাল গিয়া দেখিল—জনার্দ্দন নাই, একটা বড় অর্ডার পাইয়া বড়বাজার লোহাপটিতে গিয়াছেন। ফিরিতেছিল, কিন্তু ঠিক দুপুরের রোদে অনেকখানি পথ হাঁটিয়া বড় কষ্ট হইয়াছে, একটু না জিরাইলে পারা যায় না। জুতা খুলিয়া ফরাসের উপর বসিয়া খানিক পাখা করিল। আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তবু জনার্দ্দনের দেখা নাই। আজ আর হইবে না।

উঠিয়া জুতা পায়ে দিতে গিয়া নবগোপাল আর জুতা খুঁজিয়া পায় না। তক্তপোষের নিচে তাকাইয়া দেখিল, সেখানে নাই। চৌকাঠের বাহিরে যদি রাখিয়া আসিয়া থাকে—খুঁজিয়া দেখিল, সেখানেও নাই। নিমন্ত্রণ-বাড়ি নয় যে জুতা চুরি যাইবে, পাড়াগাঁ হইলে ভাবা যাইত শিয়ালে মুখে করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে ঘরেও কেহ আসে নাই। জুতা-বিভ্রাটে নবগোপাল চিন্তিত হইল। সাড়ে চারি টাকার জুতাজোড়া—একমাসও হয় নাই।

হঠাৎ দেখিতে পাইল তক্তাপোষের ওদিকের পায়ার কাছে একজোড়া মল পড়িয়া আছে। মলের অধিকারিণীর কথা মনে পড়িল। তারপর ঠাহর হইল, মলজোড়ার কাছাকাছি সিমেণ্টের একটা খালি পিপে পড়িয়া আছে, সেটা যেন নড়িতেছে।

নবগোপাল কহিল—কে? কে ওখানে? খুকী, তুমি জুতো নিয়েছ নাকি? সিমেণ্টের পিপে খুক-খুক করিয়া হাসিতে লাগিল।

নবগোপাল বলিল—ও খুকী, বেরিয়ে এস—ওখানে বিছে-টিছে কামড়াবে, অমন জায়গায় লুকিয়ে থাকে! আচ্ছা, এই আমি চোখ বুজলাম—এই—এই—কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিনে, চোখ খুলে দেখব এখানে আমার জুতোজোড়া আপনাআপনি পড়ে আছে—

জুতাজোড়া সত্যসত্যই যথাস্থানে পৌঁছিল, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নবগোপাল চোখ মিটমিট করিয়া দেখিতেছিল। কাতু পলাইয়া যাইতেছে, খাঁ করিয়া তাহার বাঁ হাতখানা ধরিয়া ফেলিল।

—ওরে দুষ্টু, শব্দ হবে বলে মল খুলে রেখে জুতো-চুরি—এত বুদ্ধি তোমার? কেমন, এইবার?

কাতু আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নবগোপালের শক্ত মুঠি খুলিল না।

হঠাৎ সে ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নবগোপাল ভারী অপ্রস্তুত হইল। বলিল—কাঁদ কেন খুকী, কি হল ?

খুকী বলিল—আমার লাগে না বুঝি! হাত একেবারে ভেঙে গেছে, উহু-হু—

মহাব্যস্ত হইয়া নবগোপাল বলিল—দেখি দেখি, কোথায় লাগল ? না, কিচ্ছু হয়নি—ফুঃ—আচ্ছা, ধূলো পড়ে দিচ্ছি, ধূলো আন একমুঠো—ধূলোপড়া ধূলোপড়া ছাগলের শিং—

কিন্তু মন্ত্র শেষ হইবার আগেই যন্ত্রণা নিরাময় হইল। নবগোপাল ধূলা পড়িতেছে, কাতু ফিক করিয়া হাসিয়াই দৌড়। দৌড়—দৌড়। পিছন হইতে নবগোপাল ডাকিতে লাগিল— খুকী, তোমার মল পড়ে রইল—নিয়ে যাও—নিয়ে যাও—

আর খুকী!

পরদিন আর কোন বাধা নাই, জনার্দ্দন বসিয়া আছেন, মহা আড়ম্বরে কাব্যচর্চ্চা হইতেছে। কাতু কাহাকেও কিছু না বলিয়া সরাসরি ফরাসের উপর গিয়া বাবার কাছে গম্ভীর হইয়া বসিয়া পড়িল। এই অতি-শান্ত মেয়েটির যেন ইহা নিত্যকার অভ্যাস। এমন একমনে শুনিতে লাগিল যে চোখের পাতাটিও নড়ে না।

কবিতা পড়া শেষ হইল। নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—কেমন শুনলে খুকী? কাতু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—ভাল। একটু পরে বলিল—তুমি অনেক ছড়া জান—আমায় শিখিয়ে দেবে ?

নবগোপাল তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিল যে উহা ছড়ার মত হেয় জিনিষ নয়—কবিতা, বইএর মধ্যে ছাপা হইয়া বাহির হয়। কিন্তু কাতু প্রত্যয় করিল না। এই লোকটা—জামা-গায়ে কাপড়-পরা আর সকলের মত মানুষ একটা—তাহার ছড়া নাকি ছাপা

হইয়া বই হয়! মাথা নাড়িয়া বলিল—তুমি বই ছাপাও? যাঃ, মিথ্যেবাদী কোথাকার—বই না আরো কিছু! কাতু সম্প্রতি বানান করিয়া করিয়া পড়িতে শিখিয়াছে, বইয়ের সম্ভ্রম বোঝে।

নবগোপালের বড় ইচ্ছা হইল, নিজের নাম ছাপানো অবস্থায় দেখাইয়া এই বোকা মেয়েটার তাক লাগাইয়া দেয়। কিন্তু বাড়ি হইতে একবার ঘুরিয়া আসিতে না পারিলে তাহার উপায় নাই। জনার্দ্দন হিসাবী মানুষ, সাহিত্য-রসিক বটে—কিন্তু মাসিকপত্র কিনিয়া পয়সার অপব্যয় করেন না।

আর একদিন দুপুরবেলা রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে—নবগোপাল খাতা বগলে ঘামিতে ঘামিতে আসিয়া রোয়াকে উঠিল। ঘরের ভিতর ফড়ফড় করিয়া ফুরসির আওয়াজ উঠিতেছে, কর্ত্তা যে বাড়িতে আছেন এবং সচেতন অবস্থায় আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, নবগোপাল পুলকিত হইয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে বিশেষ আশা রহিল না।

জনার্দ্দন ইজিচেয়ারে পড়িয়া নাক ডাকাইতেছেন, ফুরশির আওয়াজ বলিয়া যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নাকের ডাক, দূর হইতে নাক ও ফুরশির আওয়াজের প্রভেদ নির্ণয় করা দুষ্কর। কাতুও মেঝের উপর সর্ব্বাঙ্গ এলাইয়া বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে। নবগোপাল মনঃক্ষুণ্ণ হইল; এই কাঠ-ফাটা রোদে শ্যামবাজার হইতে এত পথ আসিয়াছে!

মনে হইল, কাতুর কি অসুখ করিয়াছে, ঘুমের ঘোরে কাশিয়া কাশিয়া উঠিতেছে, সমস্ত মুখ লাল, মাঝে মাঝে কাটা-কবুতরের মত ছটফট করিয়া উঠে। নবগোপাল বড় ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—কাতু, ও কাতু, কাত্যায়নী! কাতু চোখ মেলিল বটে,

কিন্তু কথা বলে না। এত ডাকাডাকি, জবাব নাই—স্বর বন্ধ হইয়া গেল নাকি? ডাক্তারেরা এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট কোন কোন ব্যারামের কথা বলিয়া থাকে বটে। জনার্দ্দনকে ডাকিয়া তুলিতে যাইতেছে, সহসা কাতু লাফ দিয়া উঠিল, বলিল—বাব্বাঃ, দুপুরে একটু ঘুমুতে দেবে না—কী জ্বালাতন! সঙ্গে সঙ্গে নাক-মুখ দিয়া প্রচুর ধোঁয়া নির্গত হইল। বোঝা গেল, সে কেন কথা কহিতেছিল না। তামাক টানিতে টানিতে জনার্দ্দন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, সাজা তামাক পাইয়া পোড়ারমুখী চুরি করিয়া টানিয়া দেখিতেছিল।

নবগোপাল বলিল—তামাক খাচ্ছিলি তুই—আমি বলে দেব, সব্বাইকে বলে দেব।

কাতু প্রতিবাদ করিল—বা-রে, আমি ঘুমিয়েছিলাম না? দেখ নি আমার চোখ বোজা? আমি তামাক খাই নি।

নবগোপাল বলিল—ও রে মিথ্যুক, তামাক খাস নি? তবে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল কেন রে—নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ইঞ্জিনের চোঙের মত?

কাতু সাফ অস্বীকার করিল—কখন? কক্ষনো নয়। অমন মিছে কথা বোলো না।

—মিছে কথা? নবগোপাল হাত ধরিয়া ফেলিল—দেখি, মুখ শুঁকে দেখি—এই এখনো গন্ধ রয়েছে, তোমার বাবাকে জাগিয়ে দেখাব। দাঁড়াও—

কাত্যায়নী তাহার কনুইতে দিল কামড়, একেবারে দু'টা দাঁত বসিয়া গেল। নবগোপাল হাত ছাড়িয়া দিয়া যন্ত্রণায় বসিয়া পড়িল। কনুয়ের সে দাগ আজও মুছিয়া যায় নাই।

নবগোপাল ভাবিল মেয়ে মানুষ হইয়া তামাক খায়, হউক না ছোটমানুষ—অমন মেয়েকে ছাই পতিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়, তাহার

রক্তটুকুও যেন মাটিতে না পড়ে। আপনার কেহ হইলে সে সেদিন ঐ মেয়েকে পিটাইয়া হাড় ভাঙিয়া দিত।

সেই পাঁচ বছর আগেকার চঞ্চল দুরন্ত কাতু আজ আনতনয়না শান্ত কিশোরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি গত বুধবারের বৃত্তান্তটা শোন—

বুধবার বিকালবেলা সেই যে বড় জল হইয়া গেল, তাহার কিছু আগে নবগোপাল যথারীতি খাতা সহ জনার্দ্দনের বাড়ি গিয়াছিল। বৈঠকখানার দুয়ার ভেজানো, সে অবস্থায় ধাঁ করিয়া ঢুকিয়া পড়িতে নাই—আগে কড়া নাড়িতে হয়, কড়া যদি না থাকে বারকয়েক সশব্দে কাশিলেও চলে। নবগোপালের ত সে কাণ্ডজ্ঞান নাই। ঘরে ঢুকিয়া মহা বেকুব হইয়া গেল। পাঁচ বছর এ বাড়িতে গতায়াত, কোনদিন গিন্নি নবগোপালের সামনে পড়েন নাই, তিনি বৈঠকখানার দিকে আসেন না। কিন্তু ঐ দিন আসিয়াছিলেন এবং বিপুল বপু লইয়া তক্তপোষের আধখানা জুড়িয়া বসিয়াছিলেন, কর্ত্তার সঙ্গে কি একটা কথা হইতেছিল। নবগোপালকে দেখিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া কেবলমাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জা রক্ষা করিলেন, ঐ বিশাল দেহখানা লইয়া অন্দরে পলাইয়া যাওয়া ত সোজা কথা নয়!

জনার্দ্দন ঠেকাইয়া দিলেন—আহা উঠছ কেন? ও যে নবগোপাল, ঘরের ছেলের মত! ওর পদ্য পড় নি? দাড়ি-টাড়ি উঠলে ঠিক রবি ঠাকুর হবে বলে দিচ্ছি—

গিন্নি আর দাঁড়াইয়া লজ্জা করিলেন না। সাধ্যও ছিল না, এইটুকু দাঁড়াইয়াই হাঁপ ধরিয়াছিল! বলিলেন—তুমি নবগোপাল? কোনদিন দেখি নি বটে, ওঁদের মুখে শুনে থাকি। দাঁড়িয়ে রইলে

কেন? বস বাবা, বস—। এবং একটু পরেই সহসা কর্ত্তার উপর ঝাঁঝিয়া উঠিলেন—হাত গুটিয়ে বসে থাকলে যে! ফর্দ্দ-টর্দ্দ কর, ভদ্দোরলোককে শুধুমুখে বিদায় করতে হবে নাকি?

গিন্নি বলিয়া গেলেন, কর্ত্তা নিরাপত্তিতে ফর্দ্দ করিতে লাগিলেন—সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতুয়া, ক্ষীরমোহন ইত্যাদি ইত্যাদি, ভদ্রলোককে ঠিক যে প্রকার অভ্যর্থনা করিতে হয়! প্রথম আলাপের দিনই গিন্নির মিষ্টান্নের কথা মনে পড়িয়াছে অথচ জনার্দ্দন পাঁচ বছর কেবল ভূরি ভূরি মিষ্টকথাই শুনাইয়াছেন। এই বস্তুতান্ত্রিক আপ্যায়নে নারীজাতির প্রতি ভক্তিতে নবগোপাল আপ্লুত হইয়া উঠিল।

গিন্নি উঠিলেন, বড় ব্যস্ত। বলিলেন—তুমি এসেছ, থির হয়ে যে দুটো কথা বলব বাবা, তার কি জো আছে? দেখিগে আবার ওদিকে, চারখানা লুচির যোগাড় ত করতে হবে!

লোকে নাকি বলিয়া থাকে, বাংলা দেশে কবিতা লিখিয়া কোন খাতির নাই!

কিন্তু পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নিজহাতে নগদ আট আনার মিষ্টান্নের ফর্দ্দ করিয়া দিয়া এবং তদতিরিক্ত লুচির প্রস্তাবের পরেও জনার্দ্দন হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—আজকে যে তুমি এসেছ, খাসা হয়েছে—তোমার কথাই ভাবছিলাম, ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন। ওরে বেহায়া মেয়ে, তারা এক্ষুণি এসে পড়বে—এ দিকে যে বড় ঘুরঘুর করছিস?

বেহায়া মেয়ে বলা হইল কাতুকে। সে ওদিকের দুয়ারের সামনে দিয়া যাইতে যাইতে নবগোপালকে দেখিয়া দাঁড়াইল, হয়ত ঘরেও আসিত, কিন্তু বাবার তাড়া খাইয়া সরিয়া গেল।

নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—কারা আসবে?

উপসংহার

জনার্দ্দন বলিলেন—আহিরীটোলা থেকে—কারা-টারা নয় হে—সেই একজনই, তোমাদের আজকালকার যেমন দস্তুর। আমি এ ভালই বলি--যার জিনিষ সে-ই দেখে শুনে বাজিয়ে নিয়ে যায়, মন্দ কি!

নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—কাতুর বিয়ে নাকি?

—সে কি বাপু, আমার হাত? জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিন বিধাতায় নিয়ে—যদি আর জন্মে ওদের হাঁড়িতে চাল দিয়ে থাকে, তবে ত? বাবাজীবন নিজেই দেখতে আসছেন আজ।

নবগোপাল কহিল—বেশ, ভাল কথা।

জনার্দ্দন বলিতে লাগিলেন—ভাল বলে ভাল! কাজ যদি ওখানে লেগে যায়, বুঝব মেয়ের ভাগ্যি, মেয়ের বাবারও ভাগ্যি। হাঁ—সম্বন্ধ বটে! অবিনাশ দত্তের নাম শোন নি? সে-ই—

নামটি হয়ত সুবিখ্যাত কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নবগোপাল শুনে নাই। জনার্দ্দনের কথাতেই সমুদয় পরিচয় প্রকাশ পাইতে লাগিল।—তবু গিন্নি বলেন, এমন পটের মত মেয়ে দোজবরের হাতে! আরে, লোহাপটিতে তিন-তিনখান দোকান, কমসে কম লাখো টাকা খাটছে—দোজবরে বল্লেই হল? সুভালাভালি দু-হাত এক হোক, তারপর বছরের মধ্যে আমার এই ব্যবসার ভোল ফিরিয়ে না দিতে পারি ত তখন দেখো। বাবাজীবন মানুষ খুব ভাল, এরি মধ্যে অনেক আশা-টাশা দিয়েছেন—বুঝলে?

নবগোপাল বলিল—তবে আমি উঠি, আপনারা ব্যস্ত আছেন—

জনার্দ্দন বলিলেন—উঠবে মানে? আমি যে ভাবছিলাম তোমার কথাই। বাবাজীবন নিজে মেয়ে দেখবেন, আমি বাপ হয়ে কি করে সেখানে থাকব? এসে যখন পড়েছ, তুমি ঘরের ছেলে—তোমাকে

সব সেরে সামলে দিতে হবে। যে হাবা মেয়ে, কি কথায় কি সব উত্তর দিয়ে বসবে তার ঠিক কি!

যথাসময়ে বাবাজীবন আসিলেন। আধুনিক দস্তুর-অনুযায়ী নিজেই পাত্রী দেখিতে আসিয়াছেন বটে, তা বলিয়া বয়স হিসাবে তিনি কিন্তু নিতান্ত আধুনিক নহেন। ভুঁড়ি দেখিলেই প্রত্যয় জন্মে টাকা আছে এবং লোকটি কাজেরও। আসিয়াই হুকুম করিলেন, চটপট নিয়ে আসুন, কিচ্ছু সাজাবেন না—একেবারে এক কাপড়ে, যেমন আছে তেমনি—

ঝি কাতুকে লইয়া আসিল। জনার্দ্দন নবগোপালকে বিশেষ প্রকারে ইসারা করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। কিন্তু কাতু সত্যসত্যই এক কাপড়ে আসে নাই। দেখিলে হাসি আসে, সাজিলে-গুজিলে তাহাকে কি মানায়? টিপ পরিয়া চুলে পাতা কাটিয়া মা ঠাকুরমা এবং বাড়িসুদ্ধ বোধকরি বা পাড়াসুদ্ধই সকলের নানা আকারের বিবিধ গহনায় সর্ব্বাঙ্গ বোঝাই করিয়া রাঙা বেনারসীর আঁচল লুটাইতে লুটাইতে কাতু আসিয়া ঘাড় নিচু করিয়া দাঁড়াইল। অবিনাশ হাঁকিলেন—তোল, তোল—মুখটা উঁচু কর—ও ঝি, মুখটা তুলে ধর গো! ঝি মুখ উঁচু করিয়া ধরিল, কিন্তু তখনই নামিয়া পড়িল, অবিনাশ দুই চোখের দূরবীণ কষিবার সময় পাইলেন না। আর মেয়ে ঘামিয়া ঘামিয়া খুন হইতেছে, পড়িয়া যায় আর কি! নবগোপাল হাত ধরিয়া বসাইয়া দিল।

অবিনাশ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—উঁহু, বসলে হবে না—হাঁটিয়ে দেখতে হবে—ঝি, তুমি নিয়ে যাও ত ঐ কোণ অবধি—

হাঁটাইয়া দেখা হইল। খোঁপা খুলিয়া চুলের বহর মাপা হইল। হাতের কব্জিতে বুড়া আঙ্গুল ঘসিয়া ঘসিয়া অবিনাশ

সঠিক বুঝিলেন, পরিদৃশ্যমান রঙটাও মেকি নহে। কিন্তু দৃষ্টিপরীক্ষা লইতে গিয়া বাধিল মুশকিল। কাতু কিছুতেই চোখ মেলিয়া তাকাইতে পারে না। এদিকে নেপথ্য হইতে জনার্দ্দন নবগোপালকে পুনঃ পুনঃ ইঙ্গিত করিতেছেন এবং হাত-পা নাড়িয়া কাতুর উদ্দেশে শাসাইতেছেনও খুব। কিন্তু খানিকটা ঘাড় তুলিয়া তাকাইতে গিয়াই আবার নিচু হইয়া পড়ে! নবগোপাল বুঝাইতে লাগিল—এমন দেখিনি—আহা, অত লজ্জা কিসের? বুঝলেন অবিনাশ বাবু, বড্ড লাজুক—যেন একালের মেয়ে নয়। এমন ভাল আপনি মোটে দেখেন নি। কই—তাকাও, তাকাও না - আচ্ছা, আমার দিকে তাকালেই হবে - আমার দিকে—হাঁ, এই যে—ভাল করে—

কোনপ্রকারে একপলক চাহিয়াই কাতু ঘাড় গুঁজিল, যেন দু'টা চোখের খোঁচা মারিল। ছোটবেলায় আর একদিন এই মেয়েটাই দু'টা দাঁত বসাইয়া দিয়াছিল।

অবশেষে কাতু ছুটি পাইল। সঙ্গে সঙ্গে জনার্দ্দন আসিলেন এবং আসিল লুচি সহযোগে সেই সন্দেশ, ক্ষীরমোহন প্রভৃতি একখানি মাত্র রেকাবি বোঝাই হইয়া। দেখা গেল, অবিনাশের উদরে আয়তনের অনুপাতে স্থানেরও প্রাচুর্য্য আছে। নবগোপাল উঠিল। জনার্দ্দন কিছুতেই ছাড়িবেন না—শুভকর্ম্মের মধ্যে এসে পড়লে, একটা পান খেয়ে যাও। কিন্তু নবগোপাল দাঁড়াইল না।

মোড়ে আসিয়া আধপয়সার পান কিনিল, ফিরিয়া ফিরিয়া জনার্দ্দনের বাড়ির দিকে তাকাইতে লাগিল, দোক্তা লইল, আর একবার সুপারি চাহিয়া লইল, বোঁটার আগায় করিয়া একটুখানি চুনও লইল। শেষে ভকভক করিয়া অবিনাশের গাড়ি তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেলে সে বড়রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

পিছনের হাতছানি

*

বড় ছেলেটির কিছু হইল না, মেজটির কিন্তু ডাগুনায় চাড় খুব। সারা সকাল বন্ধুদের বাড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কলেজের নোট সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। বন্ধুচক্রের পরিধিও বড় কম নয়—সেই টালিগঞ্জ-বেহালা ইস্তক। ফিরিতে এগারোটা বাজিয়া যায়। ইহাতেও বোধকরি সময়ে কুলাইয়া উঠে না। তাই ইদানীং মায়ের কাছে একটা মোটর-সাইকেলের ফরমায়েস হইয়াছে।

গিন্নি আসিয়া কহিল—শুনছ গো, একটা বিশেষ কথা আছে—

গিরিজার এমন হইয়াছে যে ভূমিকা শুনিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারে, কথা খুলিয়া বলিতে হয় না। সে বাড়ির কর্ত্তা সন্দেহ নাই, কিন্তু মা ও ছেলেরা মিলিয়াই খাসা কাজকর্ম্ম চালাইয়া যায়, তাহাকে দরকার পড়ে না। কেবল যা মধ্যে মধ্যে এই প্রকার বিশেষ কথা শুনিতে হয়। কারণ, আবশ্যকমাত্রই টাকা বাহির করিয়া দেওয়া—ইহার অত্যাশ্চর্য্য কৌশলটি একমাত্র তাহারই জানা আছে।

অতএব কথাটি শুনিতে হইল। শুনিয়া গিরিজা ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল—সুমতি, শ্রীমানদের পায়ে হাত দিতে বলি নে, তবু একবার তাকিয়ে যেন দেখে তাদের বাপের পায়ে—এই এখানে কতগুলো কাটাখোঁচার দাগ।

সুমতি হাসিমুখে কহিল—তোমার সঙ্গে ওদের তুলনা? তুমি ছিলে কি লোকের ছেলে, আর ওদের বাপ কত বড়লোক!

—তা বটে! বলিয়া গিরিজাও একটু ম্লানভাবে হাসিল। বলিল—দেখ নীলগঞ্জের ইস্কুল ছিল আমার মামার বাড়ি থেকে পাকা দুই ক্রোশ—

সুমতি হাত মুখ নাড়িয়া বাধা দিয়া বলিল—আবার সেই সাতকাণ্ড রামায়ণ শুরু করবে নাকি এখন? রক্ষে কর মশাই, আমি চলে যাচ্ছি—আমার ঢের কাজ—

ছোট মেয়ে মিনা কুকুর-বাচ্চাটাকে কোলে লইয়া এতক্ষণ বিস্কুট খাওয়াইতে ছিল। সে-ও উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—মা, গাড়ি বের করতে বলি? আজ কিন্তু এক ঝুড়ি ফুল চাই আমার, আজকে পুতুলের বিয়ে—

গিরিজার একটা নিশ্বাস পড়িল। ইহারা কেহই তাহার সে ইতিহাস শুনিতে চায় না। তার বয়স পঞ্চাশের কোঠা পার হইয়া গিয়াছে। এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে আনন্দ ও অশ্রুজলে নিষিক্ত জীবনের কতকগুলি দিন হেলা-ফেলায় ছড়াইয়া রাখিয়া আসিয়াছে। এখন বার্দ্ধক্যের সীমায় আসিয়া মুখ ফিরাইয়া তাহাদের হয় ত মাঝে মাঝে দেখিতে ইচ্ছা করে। সত্যই ত! তার নিজের ভাল লাগে বলিয়া যাহাদের সে বয়স নয় তাহাদের ভাল লাগিবে কেন? তার উপর কাহিনীটা একেবারেই ঘরে ঘরে যে রকম ঘটিয়া থাকে, তাই—

অর্থাৎ কচি ছেলে ও বিধবাকে রাখিয়া গিরিজার বাবা মারা গেলেন—দয়া করিয়া কোন অবিবাহিতা মেয়ে রাখিয়া যান নাই। দেনায় ভিটা বিক্রি হইল। গিরিজার মা ছেলে লইয়া ভূষণডাঙায় ভাইয়ের বাড়ি উঠিলেন। ভাই সীতানাথবাবুর বাড়ি গোমস্তাগিরি করিতেন। সীতানাথ ঐ গ্রামেরই—গ্রাম সুবাদে ওঁদের সকলের

দাদা। অবস্থা ভাল, মানে চার গোলা ধান, ক্ষেত-খামার ও মোটা সুদে টাকা দাদনের কারবার। গিরিজা মামার বাড়ি থাকিয়া দুইক্রোশ দূরের নীলগঞ্জের বড় ইস্কুলে পড়িত। শীতকালে আসন্ন সন্ধ্যায় ইস্কুল হইতে ফিরিবার পথে খেজুরগাছের মাথায় চড়িয়া ভাঁড়ের মধ্যে পাঁকাটি দিয়া খেজুর-রস চুরি করিয়া খাইত। ইস্কুলের সেকেণ্ড-পণ্ডিত মহাশয় ব্যাকরণের একটা শব্দরূপ খাতায় পাঁচবার লিখিতে হুকুম দিয়া টেবিলে মাথা হেলাইয়া নাকডাকা শুরু করিতেন, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ঘণ্টার মধ্যে পাঁচবার লেখা সারা করিয়া কেহ যে তাঁহাকে দেখাইতে আসিবে এমন সম্ভাবনা ছিল না, অতএব নিদ্রাটা বেশ নিরুপদ্রবে ঘটিত। গিরিজা সেই ফাঁকে ইস্কুল পলাইয়া খাল পার হইয়া চরের ক্ষেতের মটরশুঁটি আনিয়া ইচ্ছামত ভোগ বিতরণ করিত। এমনি করিয়া তাহার বয়স বাড়িয়া চলিল, লেখাপড়া যে কতদূর বাড়িয়াছে তাহাতে প্রবীণেরা সন্দেহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু একদা সমস্ত গ্রামটিকে সচকিত করিয়া সে পাশ করিয়া ফেলিল তৃতীয় বিভাগে।···

গিন্নি কাপড়-চোপড় পরিয়া বাহির হইবার মুখে আর একবার হানা দিয়া গেলেন।—ওগো, ছেলেটা যখন ধরেছে, দিয়ে দাওগে— বুঝলে? বলিতে বলিতে নামিয়া গেলেন।

বেয়ারা আসিয়া সকালের ডাক রাখিয়া গেল। একখানা অমৃতবাজার পত্রিকা, খান দুই-তিন ক্যাটালগ ও একগাদা চিঠি। চিঠিগুলির উপরে নানা ফার্ম্মের নাম ছাপান আছে, অতএব ভিতরের বৃত্তান্ত না খুলিয়াও বলা চলে। কেবল একখানিতে সে-সব কিছু নাই। গিরিজা খুলিয়া দেখিয়া অবাক! মনোরমা লিখিয়াছে।

মেয়েলি হাতের গোটা গোটা অক্ষর, কাটাকুটি ও বানান-ভুলের

অন্ত নাই। মুসাবিদা যাহারই হোক, হরপগুলি সেই মনোরমার আদি ও অকৃত্রিম। কিন্তু ইংরেজিতে বাহিরের ঠিকানা লিখিয়াছে বোধকরি নীলমণি—মনোরমার স্বামী।

অসংখ্য প্রণতি পুরঃসর নিবেদন করিয়াছে—

> দাদা, এই গরীব ভগ্নীটিকে বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। মনোরমা বলিয়া যদি চিনিতে না পারেন, ঘোষেদের পুঁটির কথা আশা করি মনে পড়িবে। আজ তিন বৎসর হইল পিতাঠাকুর মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন—

এই মনোরমা ভূষণডাঙার সীতানাথ বাবুর মেয়ে—গিরিজার মামা যাহার চাকরি করিতেন। সীতানাথ মারা গিয়াছেন। পাকা দাড়ি, মাথায় টাক—তিনি গিরিজাকে বড় ভালবাসিতেন। পাশের খবর বাহির হইলে নিমন্ত্রণ করিয়া পুকুর হইতে মাছ ধরাইয়া কাতলা মাছের মস্ত মাথাটা তাহার পাতে দিয়াছিলেন। আর আদর-আপ্যায়ন যে কত, যেন ভূ-ভারতে এণ্ট্রান্স পাশ আর কেহ করে নাই!

> —পিতাঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে যে কি দুর্দিন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আর কি লিখিব। গত বৎসর বন্যায় চিতলমারির বাঁধাল ভাসিয়া যায় ফলে ধানের এক চিটাও গোলায় উঠে নাই। আগের বৎসরের যাহা ছিল, তাহাতে কোনগতিকে সংসার চলিতেছে। আপনার ভগ্নীপতিকে কতদিন হইতে সকলে মিলিয়া বলিতেছি যে ভদ্রলোকের ছেলের চাষবাস করিয়া পোষায় না, কলিকাতায় গিয়া চাকুরি-বাকুরি কর, কিন্তু এমন অবুঝ মানুষ কখন দেখি নাই। দুঃখের কথা আর কি লিখিব, মেজ খোকা ও ছোট খুকী আজ তিন মাসের বেশি ভুগিয়া ভুগিয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে, গঞ্জের ডাক্তার ডাকিয়া যে তাহাদের একবার দেখাইব এমন পয়সা নাই। অবশেষে উনি রাজি হইয়াছেন। জোত-জমি মোড়লদের সহিত ভাগ-বন্দোবস্ত

> করিয়া দিয়া উনি আপনার কাছে যাইতেছেন। অতি সত্বর একটা চাকুরি ঠিক করিয়া দিবেন, অন্যথা না হয়। শুনিলাম, আপনি খুব বড় একটা আপিসের বড়বাবু—সাহেবেরা আপনার মুঠার মধ্যে। যেমন করিয়া পারেন, আপনার আপিসে ঢুকাইয়া লইবেন। ও-বাড়ির সকলে কেমন আছেন তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।
>
> প্রণতা—শ্রীমনোরমা মিত্র

পুনশ্চ করিয়া লিখিয়াছে—

> আগামী পরশ্ব সোমবার সকালেই উনি আপনার বাসায় পৌঁছিবেন। অবিলম্বে একটা চাকুরির যোগাড় করিয়া না দিলে আমি তিনটি ছেলেমেয়ে লইয়া ভিটায় শুকাইয়া মরিব, আর উপায় নাই।

অর্থাৎ নীলমণির আগমন হইতেছে এবং যদি বাড়ি হইতে বাহির হইবার পথে হাঁচি-টিকটিকির কোন উপদ্রব না ঘটিয়া থাকে, মেজ খোকা ও ছোট খুকী নূতন কোন গোলযোগ বাধাইয়া না বসে, তাহা হইলে মেলগাড়িতে সারারাত্রি জাগিয়া চোখ লাল ও গুঁড়া-কয়লায় সর্ব্বাঙ্গ বোঝাই করিয়া এখনই এই বাড়িতে দর্শন দিবেন।

গিরিজার মনে পড়িয়া গেল, একটা সুযোগ আছে বটে। আজ-কালের মধ্যেই তার অপিসের হেড-ক্লার্ক বাবু তিন মাসের লম্বা ছুটি লইয়া শরীর মেরামত করিতে পশ্চিমে যাইতেছেন। সেকেণ্ড ক্লার্ক তার জায়গায় কাজ করিবেন। তাহা হইলে মাস তিনেকের জন্য আপাতত নীলমণিকে ঢুকাইয়া লওয়া যায়।

নীলমণির কপাল ভাল এবং গিরিজারও। কারণ, চাকরি না হইলে কতদিন যে এই বাসায় পড়িয়া অন্ন ধ্বংস করিত, বলা যায় না। পুঁটির স্বামীকে ত তাড়াইয়া দেওয়া যায় না!

পুঁটির নাম করিলেই কেন জানি না মনে আসে, কোথায় কবে সে একটা ছবি দেখিয়াছিল একটা লাউয়ের দু'টা ঠ্যাং গজাইয়াছে—সেই ছবির কথা। লাউটি যেন গুটি-গুটি পা ফেলিয়া তাহার মামার ন'টের ক্ষেতে শাক তুলিয়া বেড়াইত। কিন্তু আজ আর সে পুঁটি নাই—মনোরমা হইয়াছে এবং তিনটি ছেলেমেয়ের মা!

ঘরটা কেমন আঁধার-আঁধার ঠেকিতেছিল, গিরিজা উঠিয়া পূবের জানলাটা খুলিয়া দিল। সামনে একটা চারতলা বাড়ি দৃষ্টি আড়াল করিয়া খাড়া রহিয়াছে। বাড়ির পাশ দিয়া সরু গলি। গলির মাথায় একটুখানি ফাঁকা জমি, তাহাতে ক'টা নারিকেল গাছ। সকালের আলোয় গাছের পাতাগুলি ঝিলমিল করিয়া নড়িতেছে।

অনেকদিন—পুঁটির বিয়ের পর গিরিজা আর মামার বাড়ি যায় নাই। তারপর বয়স কতখানি ভাঁটাইয়া গিয়াছে—পুঁটিরও গিয়াছে। গিরিজা হালকা লোক নয়, ইদানীং কাজকর্ম্ম করিয়াই সময় পায় না, কলিকাতার বাহিরে যে জীবজগৎ আছে এবং তাহার সঙ্গে ঐ জগতের একদিন যে নিবিড় পরিচয় ছিল, তাহা প্রায়ই ভুলিয়া বসিয়া থাকে। তবু পুঁটির সব কথা স্পষ্ট মনে পড়িল। সেই যে শ্যামল ছোট মেয়েটা রুক্ষ চুলের বোঝা কস্তাপেড়ে শাড়ীর আঁচল এবং কালো ডাগর চোখ নাচাইয়া যেখানে সেখানে পাড়াময় ঘুরিয়া বেড়াইত—সে আজ গৃহিণী হইয়াছে, বড় কলসী কাঁখে করিয়া দীঘির ঘাটে জল আনিতে যায়, ধান ভানে, ছেলেমেয়ের খবরদারি করে, হয়ত বড় জ্বালাতন হইলে ছেলে ঠেঙাইয়া আবার নিজেই কাঁদিতে বসে, কোন্দল করে, সারারাত জাগিয়া রোগা ছোট মেয়েটিকে বাতাস করে—এবং সেই পুঁটি আজ লিখিয়াছে, গিরিজা চাকরির যোগাড় করিয়া না দিলে তাহারা ভিটায় শুকাইয়া মরিবে।…

নিচে বাথরুমের কাছে অকস্মাৎ ভয়ানক রকমের বীররসের শুরু হইল, অর্থাৎ এতক্ষণে বড় ছেলের ঘুম ভাঙিয়াছে। আশ্চর্য্য নয়, রামায়ণে লেখা আছে—কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙিলে নাকি ত্রিভুবন সুদ্ধ কাঁপিত।

আর ভূষণডাঙায় এখন হয় ত গোবর-নিকানো কাঁচা দাওয়ার উপর চাটাই পাতিয়া বসিয়া মনোরমার ছেলে দুলিয়া দুলিয়া পড়া মুখস্থ করিতেছে, ঘুনশিতে বাঁধা গলার একরাশ নানা আকারের মাদুলি সঙ্গে সঙ্গে দুলিতেছে। মনোরমা খালের ঘাটে সেই বাঁকা তালগাছটার গুড়িতে বসিয়া মাজন নিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া কড়াই মাজিতেছে। তালগাছটা কি এতদিন বাঁচিয়া আছে?—কবে উপড়াইয়া খালে পড়িয়া গিয়াছে, তার ঠিক নাই। একদিন কচি তাল কাটিতে গিয়া ঐ গাছের বাগুড়ায় পা হড়কাইয়া গিরিজা পড়িয়া গিয়াছিল। খালের জলে পড়িয়াছিল বলিয়া লাগে নাই, কিন্তু পুঁটি বাড়িতে তার মাকে বলিয়া দিয়া মার খাওয়াইয়াছিল।... নীলমণিকে চাকরি করিয়া দিতেই হইবে। পুঁটি লিখিয়াছে, পুঁটি তার পর নয়। ঐ পুঁটির সঙ্গে একটা বড় সম্পর্ক ঘটিতে ঘটিতে বড় বাঁচিয়া গিয়াছে। সেটা গিরিজার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়।

গিরিজার পাশের খবর আসিল এবং সীতানাথ নিমন্ত্রণ করিয়া কাতলা মাছের মুড়া খাওয়াইলেন। সেই দিন সন্ধ্যায় মামা মায়ের সঙ্গে তার বিয়ের কথা বলিতেছেন। নিজের বিয়ের প্রসঙ্গ কে না শুনিতে চায়? গিরিজাও চুরি করিয়া শুনিল। সীতানাথ বাবু বড় ধরিয়াছেন, তাঁহার ছেলে নাই, ভিটায় প্রদীপ জ্বলিবে না, সেই আশঙ্কায় পুঁটিকে গিরিজার হাতে সমর্পণ করিয়া তাকে ঘরজামাই করিয়া রাখিতে চান। মামা সীতানাথের নানাবিধ আয়ের বিস্তৃত

ফিরিস্তি দিয়া গিরিজা যে কতদূর সুখে থাকিবে উৎফুল্ল মুখে তাহার পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন। ম্লান দীপালোকে মায়ের মুখভাবটা ঠিক ঠাহর হইতেছিল না, তিনিও বোধকরি বিমুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন—কিন্তু সে ঘর-জামাই হইবে এবং পুঁটি তাহার বউ হইবে, কোনটাই গিরিজার ভাল লাগিল না। আলো জ্বালাইয়া ঢোল ও সানাই বাজাইয়া পাল্কী চড়িয়া ক্রোশের পর ক্রোশ মাঠ বাঁওড় ধানক্ষেত ও বাঁশবাগান পার হইয়া এক নূতন গ্রামে যাইবে, তারপর শুভদৃষ্টির সময়ে একখানি খাসা টুকটুকে মুখ দেখিবে যাহাকে সে আর কোনদিন দেখে নাই। সে কেমন মজা! আর এই পুঁটি লালচেলীতে সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া জবুথবু হইয়া তাহার পাশে দাঁড়াইবে, একথা ভাবিতেই হাসি পায়।

পরদিন সকালবেলা রথখোলার গাছে চড়িয়া সে জামরুল খাইতেছিল, দেখিল পুঁটি চলিয়াছে। ডাকিল—এই দাঁড়া! পুঁটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল—না, দাঁড়াবার কি জো আছে, আজ যে আমার ছেলের সঙ্গে চারুর মেয়ের বিয়ে। কালা-দা'র কাছে যাচ্ছি, কলার খোলার পাল্কি করে দেবে বলেছে···ও গিরি-দা, দুটো ভাল জামরুল ছুঁড়ে দাও না—বলিয়া পুঁটি লোলুপ চোখে গাছটির দিকে চাহিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

গিরিজা ভাবীবধূর সঙ্গে প্রেম-সম্ভাষণ শুরু করিল—তোকে ছাই দেব মুখপুড়ী, দাঁড়াতে বললাম তা নয় ফরফরিয়ে চল্লেন কালার কাছে। যাক না এই ক'টা মাস—আসুক অঘ্রাণ, তারপরে দেখে নেব। তখন কালার কাছে গেলে ধরব চুলের মুঠি—

পুঁটি রাগিয়া বলিল—সকালবেলা গাল-মন্দ কোরো না বলছি। জেঠাইমাকে যদি না বলে দিই—

গিরিজা নিরুদ্বেগ কণ্ঠে কহিল—বলগে যা। তাতে আর কিছু

হচ্ছে না, মণি। বাড়িতে শুনে দেখিস—তোর সঙ্গে আমার বিয়ে। আগে হয়ে যাক, মজাটা টের পাবি। তখন কথার উপর জবাব করলে পিঠের উপর তিন কিল—বলিয়া গাছের উপর হইতেই উদ্দেশে শূন্যে মুষ্টি সঞ্চালন করিল।

এই নিদারুণ সম্ভাবনার কথা শুনিয়া পুঁটির মুখখানা কেমন হইয়া গেল, আর ঝগড়া করিতে জোর পাইল না। তবু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মুখ ঘুরাইয়া বলিল—ধ্যেৎ!

—সত্যি কিনা বুঝতে পারবি তখন। নে—নে—আর দেমাক করে চলে যায় না, এই ক'টা নিয়ে যা। সে কয়েকটা জামরুল ছুঁড়িয়া দিল। কিন্তু পুঁটি লইল না।

গিরিজা ভাবিল, বিবাহ করিলে পুঁটিটাকে কিন্তু খুব জব্দ করা যায়। সেদিন ছিপ তৈরির সময় একটু ধরিয়া দিতে বলিয়াছিল, তা মুখের উপর না বলিয়া চলিয়া গেল। আর একদিন পুঁটির মার তাস চুরি করিয়া ঢেঁকিশালে বসিয়া ক'জনে খেলিতেছিল। একখানা পঞ্জা হয় হয়, আর সেই সময় কিনা পুঁটি মাকে ডাকিয়া আনিয়া বকুনি খাওয়াইয়া তাস কাড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল! কিন্তু বউ হইলে এ সকল চলিবে না, তখন গিরিজা যা বলে তাই করিতে হইবে এবং যাহার কাছে নালিশ করুক গিরিজাই হইবে হাইকোর্ট। আর তখন পুঁটিদের দক্ষিণের ঘরে তক্তপোষের উপর বসিয়া সকলের সামনে শাশুড়ীর ঐ তাস লইয়া সে বিন্তি খেলা করিবে, তবে ছাড়িবে।

কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসে সুপারি-কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া কনের বাজু কণ্ঠমালা সমস্তই গড়ানো সারা, তবু বিবাহ হইল না। নূতন ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, আগের দিন সীতানাথের স্ত্রী আসন্ন শুভকার্য্যের

খরচের জন্ম অনেক রাত্রি অবধি চিঁড়া কুটিলেন। পরদিন আর উঠিতে পারিলেন না, বুকে বড় ব্যথা এবং একুশ দিনের দিন পাড়ার সকলে তাঁহার মাথা ভরিয়া সিঁদুর ও দুই পায়ে আলতা পরাইয়া চিতায় তুলিয়া দিয়া আসিল। শুভকর্ম্মে বাধা পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে গিরিজা এক দূরসম্পর্কীয় পিসে মহাশয়ের সঙ্গে চাকরি করিতে কলিকাতায় গেল। মাস দুই উমেদারি করিয়া চাকরি জুটিল—এক মার্চ্চেণ্ট অফিসে বিল-সরকারি। কয়েক মাস পরে ইহা ছাড়িয়া দিয়া কাকিনাড়ায় একটা পাটকলে ঢুকিল, কুলিদের হাজিরা লিখিবার কাজ। চাকরিটা ভাল—দু-চার পয়সা উপরি আছে। তাহার পর তিরিশ বছর উপরওয়ালার মন ভিজাইবার নানা কৌশল আয়ত্ত করিয়া আজ সেখানকার বড়বাবু হইয়াছে।

চাকরির প্রথম কয়েক বছর মা ভাইয়ের বাড়িতেই ছিলেন এবং গিরিজার ভূষণডাঙায় যাতায়াত ছিল। একবার পূজার সময় সীতানাথ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—আর কেন বাবা, পরের গোলামি করে শরীরের এই হাল করছ? আয়না ধরে দেখ ত কি দশা হয়েছে! আফিসের খাটনি কি সোজা? তুমি বরঞ্চ এই মরশুম থেকে ক্ষেতের কাজ দেখ। বুড়ো হয়েছি, আর পেরে উঠিনে। যা কিছু ক্ষুদ-কুঁড়ো আছে তোমরা বুঝে-সুজে নাও। গড়িমসি করে ক'বছর কেটে গেল, এবারে আর দু'হাত এক না করে ছাড়ছি নে।

গিরিজা জবাব দেয় নাই, ঘাড় নিচু করিয়া হবু-জামাইদের যেমনটি হইতে হয়, তেমনি ভাবে চলিয়া গেল। কিন্তু ঐ যে ঠায় রৌদ্রে তেপান্তরের মাঠের মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়া ক্ষেতের মাটি উপযুক্তরূপ গুঁড়ানো হইল কি না এবং আরও কত বোঝা সার উহাতে ঢালিতে

হইবে—এই সব তদারক করিয়া বেড়ানো মোটেই ভদ্রতাসঙ্গত বলিয়া ঠেকিল না।

একটু পরে সে রান্নাঘরের মধ্যে পুঁটিকে আবিষ্কার করিয়া বলিল—পুঁটি, একটু চা করে দে না লক্ষ্মিটি। পুঁটির বয়স বাড়িয়াছে, চোখের তারা একটু বেশি স্থির ও যেন বেশি কালো হইয়াছে। সে খাসা চা তৈয়ারি করে।

পুঁটি চা করিতে লাগিল। গিরিজা কলিকাতার গল্প শুরু করিল। শহরের গল্প শুনিতে পুঁটির বড় ভাল লাগে। সেখানে রেড়ির তেল দিয়া প্রদীপ জ্বালাইতে হয় না, কল টিপিলেই আপনি জ্বলিয়া উঠে। আকাশে যে ঝিলিক মারে উহাকে সাহেবেরা তারের ভিতর পুরিয়া রাখিয়াছে, বড় বড় গাড়ি ঐ তার ছুঁইয়াছে কি, গড়গড় করিয়া চলিতে থাকে। সকল কথা পুঁটি বিশ্বাস করে না। তবে চিড়িয়াখানা ও বায়োস্কোপ তাহার বড় দেখিতে ইচ্ছা করে। বর্ণ-পরিচয় যখন তাহার শেষ হইল তখন প্রথম পাতায় নিচে বানান করিয়া দেখিল, লেখা আছে কলিকাতা। তারপর সে পড়িয়াছে—শিশুশিক্ষা, পাকপ্রণালী, মহাভারত, কঙ্কাবতী, কুঞ্জলতার মনের কথা—কত বই! সব বইয়ে সেই এক জায়গার নাম দেখিয়াছে, কলিকাতা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বইওয়ালা কলিকাতায় বসিয়া বই তৈয়ারি করে। কলিকাতা শহরটা তার বড় দেখিতে ইচ্ছা করে। ফস করিয়া বলিল—আমাকে একবার নিয়ে যাবেন কলিকাতায়?

গিরিজা তাহার দিকে একটুখানি চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল—যাবই ত। বাধা পড়ে গেল যে—নইলে এতদিন কোন কালে নিয়ে যেতাম—

গিরিজার হাসি দেখিয়া পুঁটির খেয়াল হইল। সে লজ্জায় মরিয়া গেল—আর কথা না কহিয়া চা করিয়া দিয়া ওঘরে চলিয়া গেল।

মাস কয়েক পরে সীতানাথ সদম্ভে একদিন চাটুয্যের আটচালায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—ক্ষেপেছ দাদা, ঐ চটকলের কুলির হাতে মেয়ে দেব আমি? কাজ ত কুলির সর্দ্দারি, ইজ্জতের সীমা নেই! কুলিরা হপ্তাভোর খেটে যা রোজ পাবে, তার উপর ভাগ বসানো—ও চাকরি ক'দিন? যেদিন সাহেবেরা টের পাবে গলাধাক্কা দিয়ে দূর করে দেবে।...আমি ঐ নীলমণির সঙ্গে কথা পাকা করলাম। খাসা ছেলে, মুখে কথাটি নেই, পাশ-টাশ নাই বা করেছে, পাশ করেই বা কে কি করছে—

তিন-চার দিনের মধ্যেই সীতানাথের উষ্মার হেতুটা সকলের কাছে প্রকাশ পাইয়া গেল। গিরিজা কাহাকেও কিছু না জানাইয়া বিবাহ করিয়া বসিয়াছে। কি করিয়া কবে যে সুমতির সঙ্গে এই বিবাহের আয়োজন শুরু, তাহা সে-ই বলিতে পারে। গিরিজা শুনিয়াছিল, সুমতি শহুরে মেয়ে, চালাক চতুর, আবার ইংরাজি পড়িয়াছে। তাহার প্রমাণ পাইতেও দেরি হইল না। ফুলশয্যার রাত্রিতে আর উৎকণ্ঠা দমন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সুমতি, তুমি ইংরাজি জান? সুমতি বলিল—না। গিরিজা দমিয়া গিয়া বলিল—সে কি? শুনলাম তুমি ন্যাড়াগির্জ্জের মেয়েদের ইস্কুলে পড়েছ। সুমতি কহিল—ফার্স্ট বুকের খানিকটা পড়েছিলাম, তা কিচ্ছু মনে নেই। গিরিজা বলিল—মনে নেই? কখ্খনো নয়, ও তোমার দুষ্টুমি। আচ্ছা বল ত দি র‍্যাম মানে কি? সুমতি একটুখানি ভাবিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি বলিল—বর।

শুভক্ষণের বাক্য, মিথ্যা হইল না। সুমতি যেরূপ ব্যাখ্যা

করিয়াছিল, সেই প্রকারই ফলিয়া গিয়াছে। গিরিজার অবস্থা ভাল হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর বড়দরের আত্মীয়-স্বজন জুটিয়াছে। ঐসবের সঙ্গে চলিবার কায়দা গিরিজা আজও দুরস্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু সুমতি ভারী ভারী সিন্দুক ও আলমারির চাবিগুলি এবং ততোধিক ভারী আত্মীয়-সম্প্রদায় মায় গিরিজাকে পর্য্যন্ত অক্লেশে বহিয়া বেড়ায়। আজ পঞ্চাশের পারে পৌছিয়া সংসারের রথচক্রের বিরাট বহর দেখিয়া গিরিজা ঘাবড়াইয়া যায় এবং ভাবে, ভাগ্যিস মেষশিশুর মত হাবা নিতান্ত আনাড়ি ঐ মনোরমার সঙ্গে তার বিয়ে হয় নাই!

সীতানাথ বাবু পাটোয়ারি ব্যক্তি, মনে যাহাই থাকুক বাহিরে কোন কাজে কাহারও খুঁত ধরিবার সাধ্য নাই। নীলমণির সঙ্গে বিবাহ সাব্যস্ত হইলে যথাসময়ে গিরিজার কাছে পোষ্টকার্ডের চিঠি আসিল যে মনোরমা তাহার বোনের সামিল, অতএব গিরিজাকেই খাটিয়া-খুটিয়া শুভকর্ম্মটি সুসম্পন্ন করিতে হইবে। গিরিজা অফিসের ছুটি করিয়া পতিব্রতা মার্কা সিঁদুর-কৌটা এবং একজোড়া গিনি সোনার শাখা কিনিয়া যথাসময়ে ভূষণডাঙায় পৌছিল। মামী-ঠাকরুণ আর অকারণ বিলম্ব করিলেন না, সীতানাথ যে তাহাকে চটকলের কুলি বলিয়াছেন—পৌছিবামাত্রই যথাসম্ভব গুছাইয়া বর্ণনা করিলেন এবং মন্তব্য করিলেন—ঐ কৌটায় সিঁদুর ভরিয়া না দিয়া বাসি উনান হইতে বিনামূল্যের বস্তু-বিশেষ ভরতি করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু গিরিজা খুব খাটিল, আগাগোড়া পরিবেশন করিল, চেঁচাইয়া গলা ভাঙিল, নীলমণির মাথায় দইয়ের হাঁড়ি উপুড় করিয়া মাঘের রাত্রিতে তাহাকে নাওয়াইয়া তবে ছাড়িল।

খাটিয়া-খুটিয়া সকলে বিয়ে-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে শুইয়া পড়িয়াছে।

ফরাসের উপর ঢালা বিছানা এবং গিরিজার ঠিক পাশেই তাহার মামা, তাঁহার বোধকরি একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। পাড়ার বৌ-ঝিরা বিদায় লইয়াছেন, বাসরঘরে আর গণ্ডগোল নাই। বরের সঙ্গে পুঁটি কিরূপ প্রেমালাপ করিতেছে, সেটা গিরিজা একটু দেখিবার প্রয়োজন বোধ করিল। কিন্তু মামার নিদ্রাকে বিশ্বাস নাই। বুড়া বয়সে কাশির দোষ ত আছেই, তা ছাড়া রাত্রির মধ্যে অন্তত বার আষ্টেক তামাকের পিপাসা হয়। এখনই হয়ত টিকা ধরাইতে বসিবেন এবং পাশে গিরিজাকে না দেখিলে যতগুলি ভদ্রলোক এখানে ঘুমাইতেছেন সকলকে জাগাইয়া রীতিমত তদন্ত শুরু হইবে। গিরিজা মাথার বালিশটার উপর পাশবালিশটা শোয়াইল এবং পাশবালিশের আগাগোড়া লেপমুড়ি দিয়া খাট হইতে নামিয়া আসিল। নিচে মেজের উপর কখন আসিয়া শুইয়াছে ও-বাড়ির ছোকরা চাকর বনমালী। গিরিজা তাহা জানে না, অন্ধকারে তাহার ঘাড়ের উপর পা চাপাইয়া দিতেই সে হাউমাউ করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মাতুল মহাশয়েরও ঘুম ভাঙিল এবং আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া আরম্ভ করিলেন—কি! কি! কি! গিরিজা চট করিয়া মেজেয় বসিয়া পড়িয়া বনমালীর মুখে হাত দিল। ব্যাপারটি বুঝিয়া ফেলিয়া বনমালী সামলাইয়া বলিল—কিছু নয়—একটা বেড়াল। হামাগুড়ি দিয়া গিরিজা বাহিরে আসিল। তারপর বাসরঘরের বেড়ার বাখারি ফাঁক করিয়া সমস্ত শীতের রাত্রি ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু পুঁটি চেলি জড়াইয়া ভৌগোলিক পৃথিবীর মত গোলাকার হইয়া পড়িয়াছিল। বেচারা নীলমণি চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, সোহাগ অভিমান ক্রোধ—মায় দোরের খিল খুলিয়া বাহির হইবার উপক্রম পর্য্যন্ত, কিন্তু তাহাতে অন্যপক্ষের

চুড়িগাছি পর্য্যন্ত নড়িল না। হতোৎসাহ হইয়া অবশেষে নীলমণি নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিল। নীলমণির দুর্গতি দেখিয়া গিরিজা সেদিন খুব খুশি হইয়াছিল।...

নিচে অরগ্যান বাজিয়া উঠিল, গানের মাস্টার আসিয়াছেন। তৎসহ সঙ্গীত, মিনার গলা—'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী'। মিনারা তবে বেড়াইয়া ফিরিয়াছে! গিরিজা ভাবিল, ওখানে গিয়া বলিয়া আসে—বাপু হে, তোমরা ছাত্রী-শিক্ষকে মিলিয়া যে কাণ্ডটা করিতেছ ওটা কি ঠিক বাঁশীর আওয়াজের মত হইতেছে, না হৈ-রৈ শব্দে কাহাকেও বাঁশ লইয়া তাড়াইয়া যাওয়া? টেবিলে আর যে চিঠিগুলা পড়িয়া ছিল, গিরিজা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

প্রথমখানি চিঠি নহে—ওরিয়েণ্টাল কিউরো শপের বিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি আবার কলা-রসিক। ঘর সাজাইবার জন্য তিনি একটি একহাত প্রমাণ পাথরের নটরাজের মূর্ত্তি কিনিয়াছেন। কনিষ্কের প্রপিতামহের আমলের মূর্ত্তি—তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে—সে হিসাবে দাম খুব সস্তা, মোটে পচাত্তর টাকা! মূর্ত্তিটির নাক নাই বলিয়া দাম কমিয়া বাদ দিয়া দাঁড়াইয়াছে একাত্তর টাকা পাঁচ আনা।

পরের খানি জ্ঞানদায়িনী সভার সম্পাদক লিখিয়াছেন। চারি পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া অভিধানের প্রচুর জ্ঞান জাহির করিয়া গিরিজাকে বিবিধ বিশেষণে অভিহিত করণান্তর স্থূল কথাটি নিচে ব্যক্ত করিয়াছেন—কিঞ্চিৎ চাই।

তৃতীয়খানা নিতাইচাঁদ দাসের চিঠি। দাস মহাশয় বৈষ্ণব সজ্জন, ভাষাও বিনীত। সবিনয়ে জানাইয়াছেন—শতকরা মাত্র আঠার টাকা সুদ ধরিয়াও হ্যাণ্ডনোট সুদে-আসলে অনেক দাঁড়াইয়াছে।

সকাল-বিকাল বাসায় আসিয়াও নিতান্ত দুরদৃষ্টবশত গিরিজার ধরা পাওয়া যায় না। গিরিজার ন্যায় মহৎ ব্যক্তি তাহার মত কীটানুকীটের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়া অক্লেশে এতদিন মিটাইয়া দিতে পারিতেন। তিন দিনের মধ্যে নিতান্তই যদি কোন ব্যবস্থা না হয় তবে দাস মহাশয় অতীব দুঃখের সহিত আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

তারপরের খানির উপরে ছাপা—দি গ্রেট বেঙ্গল মোটর ওয়ার্কস। পেট্রোলের দাম বাকি।

তারপর, ছক্কড়লাল ক্ষেত্রী—

অতঃপর, পি মুদেলিয়ার এণ্ড কোং—

অন্যান্যগুলি গিরিজা আর পড়িল না। এইসব চিঠি পড়িয়া ইদানীং তাহার আর উদ্বেগ-আশঙ্কা হয় না। আজ বছর পাঁচেক ধরিয়া দিনের পর দিন এমনই আসিয়া থাকে, তাহাতে নূতন-কিছু নাই। চিঠিগুলি ব্লটিং-প্যাডের উপর হইতে ঠেলিয়া রাখিয়া মনোরমার চিঠিখানি সে আর একবার পড়িল।

পড়িতে পড়িতে দুঃখ হইল, আজ সীতানাথ বাবু যে বাঁচিয়া নাই! থাকিলে দেখিতে পাইতেন, চটকলের কুলি বলিয়া একদিন যাহাকে গালি দিয়াছিলেন, তাহার কাছে তাঁর মেয়ে কত করিয়া চিঠি দিয়াছে। ইচ্ছা করিলে সে অক্লেশে নীলমণির চাকরি করিয়া দিতে পারে। আর যদি তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, তবে নীলমণি গ্রামের ভিটায় ফিরিয়া মনোরমার সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া অনাহারে শুকাইবে।

আবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হইল, সীতানাথ বাঁচিয়া থাকিলে অবশ্য চমৎকার হইত—কিন্তু তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে এবং

পিছনের হাতছানি

আশঙ্কার বিষয় স্বর্গ হইতে নাকি সর্ব্বত্র নজর চলে। এই যে চিঠির গোছা গিরিজা একপাশে ঠেলিয়া রাখিল—কলিকাতা শহরের কত লোকের সঙ্গে তাহার আনাগোনা, কেহই ইহার খবর রাখে না। কিন্তু এগুলি সেই স্বর্গীয় পাটোয়ারী ব্যক্তিটির নজর এড়াইতে পারিয়াছে ত?

গিরিজা তখন খুব ছোট, একদিন কি খেয়াল চাপিয়াছিল—তার ছোট রাঙা ছাতাটা মাথায় দিয়া হন-হন করিয়া বড় রাস্তা দিয়া গঞ্জমুখো চলিয়াছিলেন। মা পিছন হইতে ডাকিতেছিলেন—ও খোকা, বাসনে—ফিরে আয়, ফিরে আয়। খোকা শুনিল না, এক একবার পিছন ফিরিয়া মায়ের দিকে তাকায়, হাসে, আরো জোরে জোরে চলে। তারপর মা ছুটিয়া আসিয়া তাকে কোলে করিয়া ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। ঘটনাটা কিছুই নয়, ভূষণডাঙার কথা ভাবিতে এমনই মনে পড়িয়া গেল যে তাহার মা বাঁচিয়া নাই।

সেই গ্রামটিকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। এখন যাহারা খালে ছিপবড়শিতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, কেহই গিরিজাকে চিনিতে পারিবে না। আর এই বুড়া বয়সে সে যদি তলতাবাঁশের ছিপ কাটিয়া খালের পাড়ে তাহাদের পাশে বসিতে যায়—কেবল হাস্যকর নহে, এখনই ছক্কড়লাল-নিমাইচাঁদ-সুমতি-কোম্পানী ব্যাপারটি রীতিমত মর্ম্মান্তিক করিয়া তুলিবেন। গত বৎসর গিরিজার নিউমোনিয়া হইয়াছিল। বড় বড় ডাক্তার ডাকিয়া এবং বিস্তর তদ্বির করিয়া সুমতি ও পুত্রকন্যারা তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিল—বোধকরি তাহার অভাবে বাসাখরচের অসুবিধা ঘটিবে এই আশঙ্কায়। যমালয়ে পলাইয়াও যে স্বস্তি পাইবে সে পথ ইহারা মারিয়া রাখিয়াছে। মা

বাঁচিয়া থাকিলে এবার একবার ভূষণডাঙায় বেড়াইয়া আসিত। মনোরমার বিয়ের পর আর ওদিকে যাওয়া ঘটে নাই।

মনোরমার বিয়ের পরদিন গিরিজা সকাল সকাল খাইয়া ট্রেন ধরিবার জন্য ছুটিতেছিল। বিলের প্রান্তে আমবাগানের সরু পথে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন সময় পিছনে গ্রামের মধ্যে বাসি-বিয়ের সানাই বাজিয়া উঠিল। বিলের মধ্যে পড়িয়া আর শোনা গেল না। এই সমস্ত গিরিজা ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ কত বৎসর পরে যৌবন পার হইয়া আসিয়া মনোরমার চিঠির সঙ্গে যেন সেই সানাইয়ের একটুখানি সুর কানের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুঁটির সঙ্গে যখন তার বিয়ের কথা চলিতেছে, পুঁটি বলিয়াছিল—আমাকে নিয়ে যাবেন কলকাতায়? আর সে জবাব দিয়াছিল—যাবই ত। আজ যদি জীবনের সেই মোহনায় ফিরিয়া গিয়া পুঁটির সঙ্গে তার দেখা হয়, গিরিজা ঠিক বলিত—ওরে মুখপুড়ি, তোর এ দুর্বুদ্ধি কেন হইয়াছে? ঐ খালের ঘাট আউশধান ও পাটেভরা চ'ন্দের বিল তকতকে নিকানো আঙিনাটুকুন—এসব ফেলিয়া কোথাও টিঁকিতে পারিবি, ভাবিয়াছিস?—এবং যদি সত্যই পুঁটির সঙ্গে তার বিয়ে হইয়া যাইত, অভাবের মধ্যে পুঁটি ঝগড়া করিত, কাঁদাকাটা করিত, তবে বড় অসহ্য হইলে ছাতা মাথায় পাটের ক্ষেতের ধারে গিয়া বসিত, তবু নীলমণির মত এখানে ধরনা দিতে আসিত না।

নিচে হইতে সাড়া আসিল—গিরিজাবাবু আছেন? গলাটা নিতাইচাঁদের মতন। দরজার কাছে মিনাকে দেখা গেল, গিরিজা ডাকিয়া বলিল—যাও, বলে এসগে বাবা বাড়ি নেই। মিনা

থোপা-থোপা চুল নাচাইয়া নিচে ছুটিল। মিনা মেয়ে ভাল; বয়স কম হইলে কি হয়, খাসা গুছাইয়া বলিতে শিখিয়াছে।

নিচে হইতে পুনশ্চ শোনা গেল—আচ্ছা খুকী, বাড়ির ভেতর বলগে ভূষণডাঙা থেকে এক বাবু এসেছেন, এখানেই থাকবেন।

অতএব নীলমণি আসিয়াছে, নিতাইচাঁদ নয়। গিরিজা নিচে নামিল। বলিল—এসেছ? বেশ, বেশ···থাক দু'চার দিন। আর, চাকরির যা অবস্থা হয়েছে—সব অফিস থেকে লোক কমাচ্ছে। সন্ধান পেলে তোমাকে চিঠি লিখে জানাব। কিন্তু চাকরির লোভে এখনকার এই পাটের মরশুমটা যেন নষ্ট কোরো না ভায়া··